উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। ২০২১-এ এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে এবং ২০২৪-এ সমগ্র দেশের মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাক্ষেত্রে গুজ্জেটচ মূল্যায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পাশাপাশি, ২০২৪-এই 12B-র অনুমোদন প্রাপ্তি ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP, 2020)-র নির্দেশনামায় সিবিসিএস পাঠক্রম পদ্ধতির পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP)-এ চার বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রমকে ছ'টি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল- 'কোর কোর্স', 'ইলেকটিভ কোর্স', 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স' 'স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স', 'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স' এবং ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স। ক্রেডিট পদ্ধতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। জাতীয় শিক্ষানীতি পরিমাণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত মানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) এবং National Skills Qualification Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম প্রস্তুতির দিশা দেখিয়েছে। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক, যা অবিচ্ছিন্ন ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি-র জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি

ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য

নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Netaji Subhas Open University

Four Year Undergraduate Degree Programme

Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) &

Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes

Course Type : Discipline Specific Elective (DSE)

Course Title : Bengal : Political History II (1203/1204-1757)

Course Code: NEC-HI-02

1st Print : <Month>, 2025

Print Order : <Memo No. and Date>

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

Netaji Subhas Open University

Four Year Undergraduate Degree Programme
Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) &
Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes
Course Type : Discipline Specific Elective (DSE)
Course Title : Bengal : Political History II (1203/1204-1757)
Course Code: NEC-HI-02

: বিষয় সমিতি :

সদস্যবৃন্দ

বর্ণনা গুহ ঠাকুরতা (ব্যানার্জি)
Director, SOSS, NSOU

ঋতু মাথুর মিত্র
Professor of History
School of Social Sciences, NSOU

সব্যসাচী চ্যাটার্জি
Professor of History
University of Kalyani

মনোশান্ত বিশ্বাস
Professor of History
Sidho-Kanho-Birsha University

চন্দন বসু
Professor of History
NSOU and Chairperson, BoS

অমল দাস
Professor (Former) of History
University of Kalyani

মহুয়া সরকার
Professor (Former) of History
Jadavpur University

রূপ কুমার বর্মণ
Professor of History
Jadavpur University

বিশ্বজিৎ ব্রহ্মচারী
Associate Professor of History
Shyamsundar College

: পাঠ রচয়িতা :

সৌভিক দাশগুপ্ত
Research Fellow
The Presidency University

: পাঠ সম্পাদনা :

চন্দন বসু
Professor of History
NSOU

: বিন্যাস সম্পাদনা :

ঋতু মাথুর মিত্র
Professor of History, NSOU

ঘোষণা

এই পাঠ উপকরণের সমুদায় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যাতিরেকে এই পাঠ উপকরণের কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা পুনরুৎপাদন এবং কোনো রকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ বে-আইনি ও নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় বিধিসম্মত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

অনন্যা মিত্র
নিবন্ধক (অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত)

নেতাজি সুভাষ
মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

UG Hisotry
NHI

Course Type : Discipline Specific Elective (DSE)
Course Title : Bengal : Political History II (1203/1204-1757)
Course Code: NEC-HI-02

পর্যায়-১ : মধ্যযুগের বাংলা : রাজনৈতিক বিকাশ (১২০১-১৫৭৫)

একক ১ ❑ পূর্ব ভারতে ইসলামের আগমন **9-19**

একক ২ ❑ মামলুকদের অধীনে বাংলা (১২২৭-৮৭) **20-26**

একক ৩ ❑ ইলিয়াস শাহ রাজবংশের অধীনে বাংলা **27-33**

একক ৪ ❑ হুসেন শাহি রাজবংশের সময়কালীন বাংলা **34-39**

একক ৫ ❑ আফগান শাসনের অধীনে বাংলা **40-48**

পর্যায়-২ : মধ্যযুগের বাংলা : রাজনৈতিক বিকাশ (১৫৭৫-১৭০৭)

একক ৬ ❑ বিহার ও বাংলায় মুঘল বিজয় **49-57**

একক ৭ ❑ জাহাঙ্গির ও শাহজাহানের আমলে বাংলা **58-66**

একক ৮ ❑ ঔরঙ্গজেবের অধীনে বাংলা **67-73**

পর্যায়-৩ : মধ্যযুগের বাংলা : রাজনৈতিক বিকাশ (১৭০১-১৭৫৭)

একক ৯ ❑ মধ্যযুগে বাংলার নগরায়ণ **74-82**

একক ১০ ❑ মুর্শিদকুলি খানের উত্থান **83-88**

একক ১১ ❑ আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে নবাবি বাংলার উত্থান **89-98**

একক ১২ ❑ সিরাজদৌল্লার অধীনে বাংলা **99-104**

একক ১৩ ❑ পলাশির যুদ্ধ (১৭৫৭) : প্রভাব **105-112**

একক ১৪ ❑ উপনিবেশিক শাসন দৃঢ়করণ **113-125**

F:\Ranjan\2025\NSOU\NEC_HI_02\NEC_HI_02_New_Mater_2025\NEC_HI_02_New_Final_(Date_17_03_2025)

Bengal : Political History II
(1203-1204 to 1757)
Course Code : NEC-HI-02

পর্যায়-১

মধ্যযুগের বাংলা : রাজনৈতিক বিকাশ (১২০১-১৫৭৫)

একক ১ ❑ পূর্ব ভারতে ইসলামের আগমন

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য
১.১ ভূমিকা
১.২ অভিবাসন তত্ত্ব
১.৩ তলোয়ারের দ্বারা ধর্মের তত্ত্ব প্রচার
১.৪ পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা ধর্মতত্ত্ব প্রচার
১.৫ সামাজিক মুক্তির জন্য ধর্মতত্ত্ব
১.৬ উপসংহার
১.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী
১.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১.০ উদ্দেশ্য

- এই পর্যায়ের উদ্দেশ্য বাংলায় বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় ইসলামের বিস্তার নিয়ে আলোচনা।
- চার ধরনের তত্ত্ব আলোচনা করা হবে।
- এই তত্ত্বগুলি হলো অভিবাসন তত্ত্ব, তলোয়ারের দ্বারা ধর্মের তত্ত্বপ্রচার, পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা ধর্মতত্ত্ব প্রচার ও সামাজিক মুক্তির জন্য ধর্মতত্ত্ব।

১.১ ভূমিকা

তৎকালীন মুঘল সাম্রাজ্যে বাংলা ছিল সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আয়ের অঞ্চল। ঠিক একই কারণে বহু পরে ব্রিটিশ শক্তি বা এই অঞ্চলে তাদের নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারিত করেছিল। আমরা সবাই জানি ব্রিটিশরা ছিল এই দেশে বিদেশি। প্রথমত এবং সর্বাগ্রে এই বিদেশিদের সঠিক জ্ঞান থাকা দরকার ছিল যে তারা কোন অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। যদিও প্রাক্-ঔপনিবেশিক নথি অপ্রতুল এবং সঠিকভাবে ভূমি ব্যবস্থা সম্বন্ধে নির্দিষ্ট করা ছিল না, যার থেকে ব্রিটিশরা কোনো ধারণা করতে পারে। সেইজন্য ব্রিটিশরা জানবার জন্য নিজেরাই নানা ধরনের জরিপ করেছিল যেমন প্রাকৃতিক সম্পদ, ভৌগোলিক উপাদান, সাংস্কৃতিক,

F:\Ranjan\2025\NSOU\NEC_HI_02\NEC_HI_02_New_Mater_2025\NEC_HI_02_New_Final_(Date_17_03_2025)

ভাষাগত বিভাজন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে তারা নৃতাত্ত্বিক জনসংখ্যা বা জাতিগত জনসংখ্যা সম্বন্ধে জরিপ করেছিল। এইরকম বিশাল একটি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গোষ্ঠী ভারতের জনগণনা হয়েছিল।

১৮৭২ সালের এই জনগণনা দ্বারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল যে দক্ষিণবঙ্গে প্রচুর সংখ্যক মুসলমান জনগণের বাস। তারা শুধু পুরনো রাজধানীর চারপাশে নয় বরং বিস্তীর্ণ বদ্বীপ সংলগ্ন

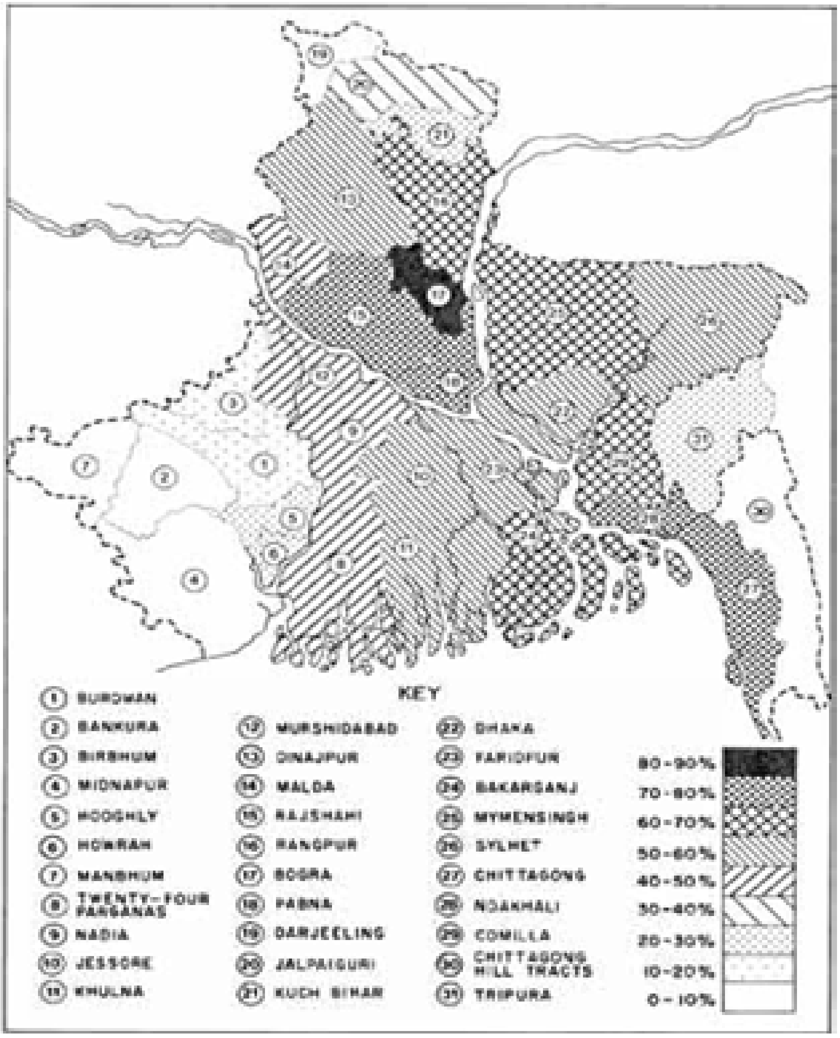

Distribution of Muslim population in Bengal, 1872

অঞ্চলগুলোতে প্রচুর সংখ্যায় বসবাস করতো। বাংলাতে ব্রিটিশদের এই অভিজ্ঞতা তুলনামূলকভাবে পরেই হয়েছিল যে পুরো রাজ্যে কতো মুসলিম জনসংখ্যা। ব্রিটিশরা কলকাতাকে কেন্দ্র করে তাদের ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা চালাত যেখানে হিন্দু জনসংখ্যা বেশি ছিল কিন্তু পূর্ববঙ্গের জেলাগুলি ছিল তুলনামূলকভাবে দুর্গম এবং তাদের সাংস্কৃতিক ভাবধারা সম্বন্ধে খুব বেশি ধারণা ছিল না। ১৮৭২ সালে

প্রথম সরকারি জনগণনার পর ব্রিটিশরা হতচকিত হয়ে গিয়েছিল এটা জানতে পেরে যে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, পাবনা এবং রাজশাহী জেলাতে মোট জনসংখ্যার ৭০ ভাগ মুসলিম এবং বগুড়া জেলাতে প্রায় ৪০ ভাগ মুসলিম। ১৮৭২ সালের জনগণনায় প্রাপ্ত এই উত্তেজক তথ্য নিয়ে আলোচনা উনবিংশ শতাব্দী পেরিয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ অবধি চালু ছিল।

একজন সরকারি আধিকারিক জেমস ওয়াইজ (James Wise/1894) এই সম্বন্ধে বলেছেন "১৮৭২ সালের জনগণনায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে জানা গিয়েছিল যে দক্ষিণবঙ্গে এত বিপুল সংখ্যক মুসলিম জনসংখ্যার উপস্থিতি। দক্ষিণবঙ্গে এবং পূর্ববঙ্গে এই এত বিপুল সংখ্যক ইসলাম বিশ্বাসী জনসংখ্যার উপস্থিতির প্রকৃত ইতিহাস এবং কারণ সম্বন্ধে খুব গুরুত্ব সহকারে চর্চা করার প্রয়োজন"।

আরো কৌতুহলজনক, বাংলার অবস্থান মধ্যযুগে মুসলিম শাসনের একদম শেষতম প্রান্তে। সুতরাং যুক্তি দ্বারা এটা বলাই যায় যে ইসলামের প্রভাব বাংলায় খুব কম হওয়া উচিত ছিল। বরং ইসলামের হৃদয়ভূমি উত্তর ভারতে এই প্রভাব বেশি হওয়া উচিত। বিশেষভাবে দিল্লি-আগ্রা অঞ্চলে (সুলতান এবং মুঘলদের বিচরণভূমি)। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাব এই অঞ্চলে শতাংশের হিসাবে মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাত ছিল বিপরীত। জনগণনায় প্রকাশিত তথ্যে জানা গিয়েছিল উত্তর ভারতে মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৫-২০ শতাংশই মুসলিম। যেখানে গোটা বাংলায় আনুমানিক ৬০ ভাগের উপর মুসলিম জনসংখ্যা এবং কোথাও আরও বেশি যেমন বগুড়া জেলায় মোট জনসংখ্যার ৮০ ভাগের উপর মুসলিম। আরেকটি রহস্যজনক তথ্য হলো মুসলিম জনসংখ্যার বেশিরভাগ অংশই কৃষক; আবার ঢাকা এবং মুর্শিদাবাদের নগর অঞ্চলে যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা বেশি হওয়া উচিত, সেখানে হিন্দু জনসংখ্যা অনেক বেশি মুসলিমদের থেকে। প্রত্যাশিতভাবে আবার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত উত্তর ভারতের ক্ষেত্রে। সেখানে অধিকাংশ কৃষকরা জাঠ হিন্দু এবং সংখ্যালঘু মুসলিমরা প্রধানত বিদেশি তুর্কি-আফগান।

সুতরাং মধ্যযুগে মুসলিম শাসনের একদম শেষ প্রান্তে অবস্থিত বাংলায় এত বিপুল সংখ্যক ইসলাম ধর্মের মানুষ কী করে এলো? ইতিহাসবিদ রিচার্ড এম ইটন (Richard M. Eaton) তার মৌলিক গ্রন্থে "The Rise of Islam and the Bengal frontier : 1204-1760" চেষ্টা করেছেন বিশদে নানা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন করা, যে কী কারণে মধ্যযুগে বাংলায় এতো বিপুল সংখ্যক মুসলিম জনগণের উপস্থিতি তা ব্যাখ্যা করা।

১.২ অভিবাসন তত্ত্ব

ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের প্রসার এবং বৃদ্ধির সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে বহু কারণের মধ্যে মূলত চারটি কারণকে ধরা হয়— চারটির মধ্যে প্রথমটি, ইতিহাসবিদ Eaton যার নাম দিয়েছিলেন "অভিবাসন তত্ত্ব", এই তত্ত্বে বলা হচ্ছে বাঙালি সমাজের ইসলামিকরণের বিস্তার ইসলামের উপর বিশ্বাসের জন্য নয়, বরং মুসলমানরা বংশপরম্পরায় অন্য মুসলমানদের থেকে এসেছে, যারা হল স্থানান্তরিত মুসলিম ইরান-মধ্যপ্রাচ্য থেকে এসেছিল। অর্থাৎ আধুনিক বাঙালি মুসলমানদের অধিকাংশই পূর্বপুরুষ ছিল তুর্ক-আফগান যারা বাংলায় আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনী হিসাবে এসেছিল বাংলাকে রাজনৈতিকভাবে

অধিকার করতে বখতিয়ার খিলজি এবং হুসেন শাহের সময়। এই বিদেশি সৈন্যবাহিনী এবং তাদের অন্যান্য সহযোগীরা যারা আক্রমণকারী হিসাবে এসেছিল, তারা বাংলায় ধীরে ধীরে বসতি স্থাপন করলো, বংশবিস্তার করলো এবং আধুনিক বাংলায় আস্তে আস্তে সমতল অঞ্চলগুলিতে মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধি হলো।

এই অদ্ভুত তত্ত্বের প্রবক্তা আর কেউ নয় উনিশ শতকের বাঙলায় বসবাসকারি অবাঙালি অভিজাত মুসলমান শ্রেণি। ১৮৭২ সালে জনগণনা রিপোর্ট বেরোবার সাথে সাথে ময়মনসিং নিবাসী একজন ধনী মুসলিম আবু এ গজনভি এই জনগণনা রিপোর্টের বিপরীতে একটি নিজস্ব রিপোর্ট প্রকাশিত করে তাতে তিনি দাবি করেন যে, কোনো ধরনের বাঙালি অমুসলিম থেকে মুসলিম ধর্মান্তকরণ হয়নি। গজনভি দাবি করেন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরা কখনই চণ্ডাল বা কৈর্বত্তদের উত্তরাধিকারী নয়, বরং তারা বিদেশি ঔরসজাত। এই মতবাদের সমর্থনে গজনভি যে বিপুল সংখ্যক আরব এবং তুর্কি অভিবাসন করে সুলতানি আমলে এবং তাদের সুলতান হুসেন শাহ বসবাস করার জন্য জমি দান করেন, প্রায় প্রতিটি গ্রামে আফগান এবং মুঘল আমলে বহুবিবাহ এবং বিধবা বিবাহের ফলে অতি দ্রুত বংশবিস্তার ঘটে। যদিও তিনি স্বীকার করেন, যে কিছু ধর্মান্তকরণ হয়, গজনভি দাবি করেন যে সেটাও নিচু জাতের হিন্দুদের থেকে হয়নি। তিনি বলেন "শুধু/নিছক এটা দাবি করা হয় কেন যে ধর্মান্তকরণ শুধু নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের থেকেই হয়েছিল", তাঁর দাবি যারা ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন তারা কেউ নিম্ন বর্ণের ছিলেন না, বরং এরা উচ্চ বর্ণের হিন্দু ছিলেন, যেমন, ময়মনসিং-এর রাজপুত দেওয়ান, সিলেটের মজুমদার জমিদার প্রভৃতি। শীঘ্রই গজনভির মতবাদ পুরো আন্তরিকতার সাথে সমর্থন পেল অন্যান্য মুসলিম গোষ্ঠীগুলো থেকে, বাংলার আশরফি শ্রেণির মুসলিমরা যারা নিজেদেরকে দাবি করতেন যে তারা বাঙালি নয় বরং তারা মধ্য এশিয়ার ফারসি রক্তের বাহক। ১৮৩৫ সালে খোন্দকার ফজলি রুবি নামে একজন একটি বই "The Origin of the Musalmans of Bangal" প্রকাশিত করেন। তাতে তার পূর্ববর্তী আবু গজনভির মতবাদের বিরুদ্ধচারণ করে লেখেন যে "স্থানীয় মুসলিম জনগণ প্রচুর সংখ্যায় হয়ত তাদের বাধ্যবাধকতার থেকে স্বাধীন ইচ্ছায় ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন সেই সময়"। বরং তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেছিলেন "আমাদের দেশের এখনকার মুসলিম জনসাধারণের পূর্বপুরুষরা অবশ্যই সেই মুসলমানরা যারা এখানে বিদেশ থেকে এসেছিল যখন এখানে বিদেশিরা অধিকার করতে এসেছিল।" রুবি দাবি করলেন বাংলার বদ্বীপ সংলগ্ন সমতলে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা প্রমাণ করে তার দাবির সত্যতা। এই অংশের মানুষেরা সবসময় বিদেশি আক্রমণের মুখোমুখি হয়ে বাধ্য হয়েছে ধর্মান্তরিত হতে এবং কালক্রমে এই অংশটা মুসলমানদের আশ্রয় স্থল হয়ে ওঠে। এর পরিণতিস্বরূপ এই অঞ্চলে বিদেশি বসতি গড়ে ওঠে।

বাংলায় সেই সময় গণ-ইসলামিকরণের ব্যাখ্যা করার বদলে এই ধরনের সূত্র দিয়ে মুসলিমদের জাতিগত বিশুদ্ধতা প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে, একশ্রেণির চরম বর্ণবাদী তথাকথিত অভিজাত মুসলিম শ্রেণি দ্বারা। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলার আদিবাসী কৃষক সম্প্রদায় একদম নিম্নশ্রেণির। সুতরাং তারা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে যায় এই শ্রেণির মানুষকে মুসলিম সমাজে মেনে নিতে। প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগে তুর্কি সুলতানিয়েতর সময় তাদের উচ্চবিত্ত মহলে জাতি এবং বর্ণের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। হিন্দুরা যারা ধর্মান্তরিত হত তাদের নিম্ন বর্ণ এবং অপবিত্র রক্ত-র মানুষ বলে তাদের প্রশাসনে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হত না, একই ধর্মাবিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও। ধর্মান্তরিত মুসলিমদের প্রতি আচরণ সব সময় সদাশয় হত না।

অভিবাসনের ফলে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা খুব অল্প কিছু সুনির্দিষ্ট অংশে প্রমাণিত হতে পারে। এই গণ্ডীবদ্ধ এলাকাগুলিতে মুসলিম সরকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মুসলিম জনসংখ্যার আধিক্য দেখতে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে উত্তর ভারত এবং পাঞ্জাবে শহরের বসবাসকারি মুসলিমরা প্রধানত বিদেশি রক্তেরই বাহক, যেমন তুর্কি, উজবেক, আফগান বা ইরানি কিন্তু বাংলায় এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এই প্রসঙ্গে আমরা James Wise যিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ সিভিল সার্জন এবং তিনি থাকতেন ঢাকাতে তার বিখ্যাত বই "The Muhammadans of Eastern Bengali" (1894) এ তার মতামত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এই বইতে তিনি গজনভির অভিবাসন তত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে খারিজ করেছেন। গজনভি কোথাও বলছেন না যে উত্তর ভারত থেকে প্রচুর সংখ্যক মুসলমান বাংলায় এসেছিল, বরং আমরা জানি যে আকবরের রাজত্বকালে বাংলার এই নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার জন্য মুসলিম আক্রমণকারীরা এই অঞ্চল এড়িয়ে চলতো। এমনকি আকবরের বনেদি মুসলিম আধিকারিকরা বাংলায় বদলিকে শাসন ব্যবস্থায় শাস্তিমূলক বদলি বলে মনে করতো। এখানেই রুবির তত্ত্ব সম্পূর্ণ বিপরীত যেখানে তিনি দাবি করেছেন যে বাংলার এই বদ্বীপ সমতলে একটির পর একটি বিদেশি মুসলিম আক্রমণ হয়েছে এবং এই অঞ্চল ধীরে ধীরে মুসলিম আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। রুবি একবারও বললেন না যে এই বিপরীত আবহাওয়া যে প্রাকৃতিক সীমানা গড়ে তুলেছিল বিদেশি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তার সম্বন্ধে। এই রকম অবস্থায় বিতর্কিত "Census of India, 1901" প্রকাশিত হয়। E. A. Gait তার এই জনগণনা-র রিপোর্টে বলেন আনুমানিক নয়-দশমাংশ (৯/১০) বাঙালি মুসলিম জনসংখ্যা তাদের স্থানীয় বলেই উল্লেখ করেছিল। Gait সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে উল্লেখযোগ্যভাবে অভিবাসী মুসলিমদের বাংলায় আগমন এবং বসতি স্থাপনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং বদ্বীপ সমতল অঞ্চলে তো আরও কম। এটি জানা গিয়েছিল অভিবাসী মুসলিমরা বাংলার উত্তরে পুরনো রাজধানীর কাছে তাদের বসতি স্থাপন করতে বেশি উৎসাহী ছিল। তারা কখনও স্বইচ্ছায় তাদের বসতি ধান উৎপাদনকারী নোয়াখালি, বগুড়া বা বাকরগঞ্জ অঞ্চলে স্থাপন করতে আগ্রহী ছিল না। শীঘ্রই সেটেলমেন্ট রিপোর্টের সঙ্গে "Bengal District Gazatters" প্রকাশিত হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথমে। উদাহরণ স্বরূপ নোয়াখালি জেলার গেজেটে (১৯১১) দেখা যায় বেশির ভাগ শেখ (মুসলিম চাষী) এবং নিচু শ্রেণির সম্প্রদায় হচ্ছে আদিবাসী বংশোদ্ভুত প্রধানত চণ্ডাল শ্রেণি। বগুড়া এবং পাবনা জেলার সেটেলমেন্ট (১৯৩০) রিপোর্টে দেখা যায় মুসলিম সম্প্রদায় হিন্দু ধর্মান্তকরণের ফলেই ঘটেছে এবং তাও খুব সাম্প্রতিক অতীতে এবং দেখা গেল বেশিরভাগ জনসংখ্যাই হচ্ছে উত্তরবঙ্গের কোচ আদিবাসীদের বংশধর। এর থেকে বোঝা যায় যে অভিবাসনের তত্ত্ব যা অভিজাত মুসলিমদের তৈরি এবং অত্যন্ত প্রিয়—আদতে ভুল।

১.৩ তলোয়ারের দ্বারা ধর্মের তত্ত্ব প্রচার

ভারত এবং অন্যত্র ইসলামের বিস্তারের সবচেয়ে পুরনো তত্ত্ব হল সৈন্যবাহিনী দ্বারা তলোয়ার সাহায্যে অর্থাৎ চাপ দিয়ে ইসলামিকরণ। সেই ক্রুসেডের সময় থেকে উনিশ শতকে অবধি এই সন্ত্রাসের

সাহায্যে ইসলামিকরণের বাড়বাড়ন্ত। এরপর ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য চেপে বসে মুসলিমদের উপর এবং বিশ্বজুড়ে ইসলাম সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় বিংশ শতাব্দী জুড়ে। ১৮৯৮ সালে Sir William Mur তার লেখায় দাবি করেন যে আরবরা (এক্ষেত্রে মুসলিম হানাদাররা) ভালবাসে যুদ্ধের গন্ধ, তারা ধর্ষণ, গণহত্যা এবং যন্ত্রণাদায়ক নির্যাতন দ্বারা অমুসলিম জনসাধারণকে বাধ্য করতো ইসলামকে কুবুল করতে।

এই তত্ত্ব (Theory) প্রমাণ করে যে মধ্যযুগে বাঙলার এখনকার এই দেশীয় মুসলিম জনসাধারণের পূর্বপুরুষদের জোর করে ইসলাম ধর্মান্তকরণ করা হয়েছিল, এর জন্য মুসলিম সৈন্যবাহিনী এবং মুসলিম প্রশাসন প্রচণ্ড নিপীড়ন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে ত্রয়োদশ শতকে তুর্কি আক্রমণকারী বখতিয়ার খিলজি-র নেতৃত্বে গণহত্যা এবং নিপীড়নের ঝড় বইয়ে দেওয়া হয় বাংলার সাধারণ মানুষের উপর। এই হানাদার বিশাল শক্তিশালী দক্ষ সৈন্যবাহিনী খুব সহজেই বাংলার বদ্বীপ সংলগ্ন সমতলে আধিপত্য বিস্তার করে। শহরগুলি লুণ্ঠিত হয়, কৃষক অধ্যুষিত গ্রামগুলো লুণ্ঠিত হয়, সঙ্গে চলে বিশাল গণহত্যা এবং যৌন নিপীড়ন। এই অত্যাচারের প্রবণতা কিছুটা পরিমাণে অব্যাহত থাকে পরের মামেলুক, হুসেন শাহ্ এবং ইলিয়াস শাহ্ সুলতানদের সময়েও। কখনও কখনও স্থানীয় হিন্দু মন্দিরগুলো ধ্বংস করে মূর্তিগুলি অপবিত্র করতেন সুলতানী সৈন্যবাহিনী যাতে অমুসলিম দেশীয় জনসাধারণের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দেওয়া যায়। এছাড়া নানা ধরনের Tax (কর), উদাহরণ জিজিয়া কর অমুসলিম নাগরিকদের উপর চাপানো হত, যাতে তারা বাধ্য হত মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করতে আরও হত্যা এবং গণহত্যা থেকে বাঁচবার জন্য।

ঔপনিবেশিক শাসকেরা (ব্রিটিশরা) বাংলায় মুসলিম আগ্রাসনের আরেকটি কারণ অঙ্কিত করেছেন সেটা হচ্ছে মুসলিমদের জঙ্গী মানসিকতা বা প্রকৃতি। উদাহরণ স্বরূপ James Wise তার বই "The Muhammadans of Eastern Bengal (1894)"-তে তলোয়ারের দ্বারা ধর্মের তত্ত্বের ব্যাপারে আরো কিছু তথ্য যোগ করেছেন। তার মতে উৎসাহী সুলতানের সৈন্যরা ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতকে ইসলামের বিশ্বাস ভীরু বাঙালিদের মধ্যে ছড়ায় এবং তার জন্য জোর করে অর্থাৎ তলোয়ারের দ্বারা ভয় দেখিয়ে, অনুপ্রবেশকারীরা ঘন জঙ্গল পেরিয়ে পূর্ব সীমান্তে সিলেটে হাজির হয় এবং সেখানেও ইসলাম বিস্তার করে। এছাড়াও জেমস ওয়াইসের-র মতে পূর্ব বাংলার গ্রামগুলি থেকে ক্রীতদাস বন্দি করে ফুলেফেঁপে ওঠে মুসলিম জনসংখ্যা। বাঁচার জন্য মরিয়া দরিদ্র পরিবারগুলো বাধ্য হয় তাদের সন্তানদের বিক্রি করে দিতে মুসলিম ক্রীতদাস হিসাবে।

ঐতিহাসিকভাবে, ঔপনিবেশিক যুগের উত্তরাধিকার অর্থাৎ স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় হিন্দু এবং মুসলিম দুই প্রতিকূল শ্রেণিবিভাগ ঘটেছিল, যেমন এই শ্রেণিবিভাগ পূর্বেও ঘটেছিল যা পাওয়া যায় প্রাক আধুনিক যুগের বাংলার ইতিহাসে। বিখ্যাত বাঙালি ভাষাবিদ এবং ঐতিহাসিক S.K. Chatterjee (১৯৬৩) এই তুর্কি বিজয়ের একটি নিম্নলিখিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কন করেছেন।

"এইসব দয়া মায়াহীন বিদেশি বা দেশ অত্যাচার এবং ধ্বংসের ভয়াবহ ঝড় তুলে বাংলা জয় করেছিল, যখন শান্তিকামী জনগণ এক অকল্পনীয় ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা—পাইকারী ধ্বংসলীলা, লুঠপাট, অপহরণ এবং নারীর দাসত্বর মুখোমুখি হয়েছিল" এছাড়া মন্দির, রাজপ্রাসাদ, মূর্তি, পাঠাগার সব ধ্বংস করে গায়ের জোরে ধর্মান্তরিত করেছিল। মুসলিম তুর্কিরা অনেকটা স্প্যানিশ (Spanish) ক্যাথলিক বিজয়ী

দলের মতো যারা মেক্সিকো, পেরু এবং আমেরিকার কিছু অংশে স্থানীয় সংস্কৃতি এবং ধর্ম ধ্বংস করে শয়তালের রাজত্ব কায়েম করেছিল।

যাইহোক, এই তত্ত্বের মধ্যে একটু ফাঁক ছিল। Peter Hardy দেখিয়েছেন যে যারা এই তত্ত্বের অনুগামী, যে ভারতীয় হিন্দুদের জোর করে ধর্ম পরিবর্তন করা হয়েছে, নাকি এটি অনুমান করা হচ্ছে, যে সমাজ তার ধর্মীয় পরিচয় পরিবর্তন করেছে তলোয়ারের সামনে। সুনির্দিষ্টভাবে এই পদ্ধতি কি তথ্যগতভাবে, না হাতে কলমে ঘটেছিল তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তার উপর এই সূত্রের প্রবক্তারা নিজেরাই বিভ্রান্ত যে এই ধর্মান্তকরণ (Conversion) উত্তর ভারতে তুর্কি-ইরানিয়ান সম্প্রসারণের (১২০০-১৭৬০) কখন হয়েছিল। এই বিভ্রান্তির কারণ সম্ভবত 'ভারতে ইসলামিক বিজয়'-ফারসি থেকে আক্ষরিক অনুবাদের কারণে। দক্ষিম এশিয়ার ইতিহাসের ক্ষেত্রে সামরিক শক্তির জোরে ইসলামের বিস্তার হয়েছে এটি খুব একটা সন্তোষজনক সূত্র নয়। Richard Eaton ব্যাখ্যা করেছেন ইসলামিকরণ কখনও সামরিক বা রাজনীতির কাজ ছিল না। একজন মনে করতেই পারে যে ভারতের এই উত্তর অংশে মুসলিম রাজবংশ খুব নিবিড়ভাবে বহুকাল রাজত্ব করার ফলে এখানে জোর করে তলোয়ারের দ্বারা ধর্মান্তকরণ করা হয়েছে এবং ফলস্বরূপ এই অঞ্চলে এখন প্রচুর মুসলিমের বাস, কিন্তু বাস্তবিক দেখা যায় তার উল্টো যে সব অঞ্চলে প্রচুর নাটকীয় ইসলামিকরণ হয়েছে যেমন পূর্ব বাংলা, পশ্চিম পাঞ্জাব যেগুলো ভারতীয় মুসলিম রাজত্বের শেষ সীমানায়। সেখানে সামরিক উপস্থিতি দুর্বল এবং যেখানে ইসলামিক শক্তির প্রভাব কম, সেই সমস্ত অঞ্চলে প্রথম সেনসাস রিপোর্টে দেখা যায় মোট জনসংখ্যার ৭০ থেকে ৯০ ভাগ জনগণ মুসলিম অথচ গাঙ্গেয় উত্তর ভারত যে অঞ্চলকে বলা যায় মুসলিমদের হৃদয় দিল্লির দুর্গ এলাকা বা আগ্রা যেখানে মুসলিম শাসন ব্যবস্থা খুব নিবিড়ভাবে এবং বহুকাল ধরে চলছে। সেখানে মুসলিম জনসংখ্যা মাত্র ১০ থেকে ১৫ শতাংশ। অন্যভাবে বলতে গেলে, যদিও এই তত্ত্ব হয়তো কিছুটা সত্যি উত্তর এবং উত্তর পশ্চিম ভারতের জন্য, কিন্তু বাংলায় সার্বিকভাবে একটি বিপরীত সম্পর্ক আছে মুসলিম রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ এবং ইসলামিকরণের মধ্যে।

১.৪ পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা ধর্মতত্ত্ব প্রচার (Theory of Religion for Patronage)

তৃতীয় সূত্র, ভারতে ইসলামিকরণের ব্যাখ্যা করার জন্য উপস্থিত করা হয়েছে, সেটি হল পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা ধর্মতত্ত্ব প্রচার। এই তত্ত্বে, প্রাক আধুনিক যুগে ভারতীয়রা ইসলামে ধর্মান্তরিত হত শাসক সম্প্রদায়ের থেকে ধর্ম বহির্ভূত সুবিধা পাওয়ার জন্য, কর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, আমলাতন্ত্রে চাকরির সুযোগ পাওয়ার জন্য এবং আরও নানা সুযোগ পাওয়ার জন্য। এই সূত্র পশ্চিমি শিক্ষিত ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক বিজ্ঞানীদের মত যারা ধর্মকে একটি ধর্মবহির্ভূত সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিচার করে যেমন সামাজিক উন্নতি লাভ, বা সম্মান বাড়ায়। এটা সত্যি, সুলতানি রাজত্বের প্রথমদিকে কোন অমুসলিমকে রাজকার্যে নিযুক্ত করা হত না, এমনকি নিম্নপদেও না। ইসলামে ধর্মান্তরিত হলে হয়তো এই সব কাজে সুযোগ পাওয়ার সুবিধা হত। ভারতীয় ইতিহাসে অনেক উদাহরণ আছে এর সমর্থনে। ১৪শ শতকের গোড়ায় ইবান

বতুতার লেখা থেকে জানা যায় সেই সময় ভারতীয়রা নিজেদেরকে খিলজি সুলতানদের সামনে নব্য ধর্মান্তরিত হিসাবে পরিচয় দিত, বিনিময়ে তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী নানাভাবে সম্মানিত করা হত। ১৯ শতকের জনগণনা প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা যায় উত্তর ভারতের অনেক জমির মালিকরা নিজেদেরকে মুসলিম ঘোষণা করে দিত কর দিতে না পারার জন্য কারাদণ্ড হবার ভয়ে, অথবা পূর্বপুরুষের জমি বাঁচাবার জন্য। এই সূত্র আরও বিস্তৃত হয় যখন দেখা যায় মুসলিম শাসকের অধীনে কাজ করা গোষ্ঠীরা মুসলিম সংস্কৃতিতে বেশি অভ্যস্ত হয়ে উঠত যদিও তারা আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মান্তরিত হয়নি। গাঙ্গেয় সমতলের কায়স্থ এবং ক্ষত্রিয়, মহারাষ্ট্রের পরাসনিস এবং সিন্ধের তামিলরা মুসলিম সংস্কৃতিতে পুষ্ট হয়ে প্রশাসনের কেরানি বা প্রশাসনিক কর্মী হিসাবে নিযুক্ত হত। এই পদ্ধতিটিকেই Aziz Ahmad তুলনা করেছেন ১৯ শতকে ও বিংশ শতকের পশ্চিমায়নের সাথে। যুদ্ধ বন্দি ও ক্রীতদাসদের মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হত। অনেক সময় তারা নিজেরা ইসলাম গ্রহণ করত সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য। পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে তারা আস্তে আস্তে তাদের প্রভুদের সংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যুক্ত হয়ে যায়। আবার জিজিয়া কর, তীর্থযাত্রী কর এগুলো অমুসলিমদের উপরই ধার্য করা হত, যেগুলো কখনও কখনও এতো মারাত্মক হয়ে উঠতো সাধারণ কৃষক যারা দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে বাস করতো তাদের জন্য এই সমস্ত অবস্থায় তাদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে ধর্মান্তরিত হতে হত শুধু এই অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, এই কর আদায়কারীদের থেকে বাঁচার জন্য।

যদিও এই তত্ত্ব হয়তো একটি ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে যে অপেক্ষাকৃত কম ইসলামিকরণ হয়েছিল তখনকার বাংলায় মূল মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে অর্থাৎ ঢাকা, গৌড় এবং মুর্শিদাবাদ সন্নিহিত অঞ্চলে। এটি ব্যাখ্যা করা যায় না যে বাংলার গ্রামাঞ্চলে রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ বা বিপুল ধর্মান্তকরণ, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা বা জোর জবরদস্তির দ্বারা করা হয়েছিল।

১.৫ সামাজিক মুক্তির জন্য ধর্মতত্ত্ব (Theory of Religion for Social Liberation)

এই ছাড়াও চতুর্থ তত্ত্ব যেটি বলছে সামাজিক মুক্তির জন্য ধর্মতত্ত্ব। প্রথমে ব্রিটিশ নৃতাত্ত্বিক এবং ইতিহাসবিদ, পরে পাকিস্তানি এবং বাংলাদেশি ইতিহাসবিদরা এবং দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম ঐতিহাসিকরা এই সূত্রটিকেই ভারতে ইসলামিকরণের সর্বাধিক প্রচলিত সূত্র বলে মনে করে। এই সূত্রে স্বতঃসিদ্ধভাবে বলা হয়েছে হিন্দু ধর্মের বৈষম্য যা কঠোরভাবে বৈষম্যমূলক তার নিজেদেরই নিম্ন বর্ণের প্রতি। হাজার বছর ধরে এই নিম্ন বর্ণের জনগণ নিপীড়িত এবং অত্যাচারিত হতে থেকেছে হিন্দু উঁচু জাতির লোকদের থেকে বিশেষত ব্রাহ্মণদের থেকে। তারপর যখন ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম এর আবির্ভাব, আগমন হলো এবং যখন সুফি সাধকদের দ্বারা এই নিপীড়িত নিম্ন বর্ণের মানুষদের জন্য সামাজিক সমতা ও মুক্তির বাণী প্রচারিত হলো, তখন এই মানুষরা ব্রাহ্মণ্যবাদের হাত থেকে মুক্তি পেতে দলে দলে ইসলাম বরণ করলো।

১৯০১ জনগণনায়ও এই বিতর্কিত সূত্রটি উদ্ভাসিত হয়েছিল, E. A. Gait উপসংহারে বলেছিলেন মোটামুটি ৯/১০ বাঙালি মুসলিম চাষীদের জাত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তারা স্থানীয় উৎসর কথাই বলতো। শ্রীঘ্রই এই একই মতের প্রকাশ পাওয়া গেল বিংশ শতকের প্রথম দিকেই প্রকাশিত Bengal Distric Gazetters থেকে। উদাহরণ নোয়াখালি জেলা (১৯১১) গেজেটিয়ার-এ জানা গেল বেশির ভাগ শেখ (মুসলিম চাষী) এবং নিচু শ্রেণির সম্প্রদায় হচ্ছে আদিবাসী বংশভূত, প্রধানত চণ্ডাল শ্রেণি। ১৯৪৭ সালের তিন দশক আগে নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় সরকারিভাবে এই মত কে নিশ্চিন্তভাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল। নানা ভিন্ন পদ্ধতি, নমুনা কৌশল বিভিন্ন প্রান্তে নানা পরীক্ষা ও সমীক্ষার পর সবাই একমত হয়েছিল যে বাঙালী মুসলিমরা স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে এসেছে এবং বাইরে থেকে নয়। ১৯৩৮ সালে প্রথম দলটি ২৪ পরগনা জেলায় এই সমীক্ষাটি পরিচালনা করেন, Eileen Macfarlance উপসংহারে বলেন বজবজ অঞ্চলে মুসলমানদের রক্তের এই সমীক্ষার পর তথ্য পরীক্ষা করে নিশ্চিন্তভাবে বলা যায় যে এরা নিচু জাতের ধর্মান্তরিত হিন্দুদের বংশধর এবং বর্ণের এখনকার হিন্দু প্রতিবেশীর সাথে তাদের অনুপাতও প্রায় সমান। তিন বছর বাদে, B. K. Chatterjee এবং A. K. Mitra আরেকবার এই রক্তের গ্রুপের ভাগ/অনুপাত পরীক্ষা করেন ২৪ পরগনার জেলার শুধু নিচু জাতের হিন্দুদের সাথে গ্রামীণ মুসলিমদের নয়, বরং গ্রামীণ মুসলিমদের সাথে শহুরে মুসলিম এবং অবাঙালি মুসলিমদের সাথে। এই পরীক্ষাতে (Study)-তে দেখা গেল গ্রামীণ মুসলিমদের সাথে নিচু জাতের হিন্দুদের একটি মিল পাওয়া যাচ্ছে মাহিষ্য এবং বাগদি শ্রেণির মানুষদের সঙ্গে, অথচ শহুরে বাঙালি মুসলিমদের সাথে ভারতের পশ্চিম সীমান্তের মুসলিমদের রক্তের মিল পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ, শহুরে মুসলিমদের দাবির সত্যতা প্রমাণিত করে যে তারা বিদেশি রক্তের বাহক।

যদিও সামাজিক মুক্তির সূত্রতে অনেক নিজস্ব সীমাবদ্ধতা আছে। এটি প্রধানত চিহ্নিত করে ধর্ম পরিবর্তনের কারণগুলোকে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে; এটা বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক যে ইসলামের জন্য সামাজিক ন্যায় বাস্তবায়িত হয়েছিল তথাকথিত হিন্দুত্বর রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যা এই সূত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ঐতিহাসিক Richard Eaton-এর যথেষ্ট বিরুদ্ধতা করেছিলেন, প্রথমত : ইটন জোরের সাথে ব্যাখ্যা করেছিলেন অতীতের মানুষের কাছে বর্তমান দিনের মূল্যবোধের গুণ কি করে আশা করা যায়, তাহলে তো এটি ইতিহাসের পশ্চাদসারণ হয়। মুসলিম আগমনের আগে ভারতের নিম্নবর্ণের মানুষ একই সামাজিক অধিকারে অর্থাৎ একই মৌলিক সমতার সহজাত ধারণা বহন করতো নিপীড়ন ও ব্রাহ্মণ্যবাদী অত্যাচারের বিরুদ্ধে, এটাই Jean Jacques Rousseau অথবা Thomas Jefferson-এর লেখায় পাওয়া যায়। আসলে প্রাক আধুনিক যুগের মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা ইসলাম ধর্মের ভাবনার সাথে হিন্দু ধর্মের তুলনায় কখনও ইসলামের সামাজিক সমতা, হিন্দু অসমতার বিরুদ্ধতার উপর আরোপ করেনি। বরং হিন্দু বহুতত্ত্ববাদের বিরুদ্ধতা করেছিল মুসলিম একেশ্বরবাদ। তাই এটিই অর্থাৎ বহুত্ববাদ বনাম একেশ্বরবাদটিই এই দুই সভ্যতার ধর্মতাত্ত্বিক নির্ণায়ক হয়ে উঠেছিল। বাস্তবিক, ইসলাম সামাজিক সমতার প্রতিপালক এই ধারণা খুব সাম্প্রতিক ধারণা, বরং এই ধারণা ইসলামে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে অষ্টাদশ শতকের আলোকপ্রাপ্তি (Enlightenment) এবং ফরাসি বিপ্লবের পর। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে মধ্যযুগে মুসলিম উচুঁ মহলে জাতিভেদ প্রথা ছিল। ধর্মান্তরিত

দেশি হিন্দুদের 'নিচু জাত' এবং 'অপবিত্র রক্ত' বলে তুর্কি প্রশাসনে কোন ভালো কাজ দেওয়া হত না যদিও দুজনের ধর্ম একই।

দ্বিতীয়ত, ইটন যুক্তি দেখিয়ে ছিলেন এমনকি যদি ভারতীয়রা বিশ্বাস করতেন মানবজাতির মৌলিক সাম্যে এবং এমনকি যদি ইসলাম তাদের সামাজিক সমতার আদর্শ দেখিয়ে থাকে তবুও দুটো প্রস্তাবই মিথ্যে। প্রচুর প্রমাণ আছে যে ভারতীয়দের ইসলামিকরণের পর তাদের সামাজিক সম্মান বা মর্যাদা কিছুই বাড়েনি। বরং অধিকাংশ ধর্মান্তকরণ-ই মুসলিম সমাজে জন্ম নির্ধারিত পদেই বহাল থাকতো যেমন তারা আগের হিন্দু সমাজে থাকতো। এটি বিশেষ করে বাংলাতেই ছিল। James Wise দেখিয়েছেন ভারতের অন্যান্য জায়গায় এইসব ছোট কাজ নিচুবর্ণের হিন্দুদের দিয়েই করানো হত। কিন্তু বাংলায় এই তথাকথিত মর্যাদাহানিকর কাজগুলো ধর্মান্তকরণ মুসলমানদের দিয়েই করানো হত। সুতরাং সামাজিক মুক্তির সূত্র ধর্মান্তকরণের ইতিহাস বুঝতে খুব সাহায্য করে না।

অবশেষে, তলোয়ার বা পৃষ্ঠপোষকতার সূত্র বা সামাজিক মুক্তির তত্ত্ব জনবসতির বিন্যাসের তত্ত্ব দ্বারা খণ্ডিত হয়ে যায়। ১৮৭২ সালে যখন প্রথম নির্ভরযোগ্য সেনসাস করা হলো তখন দেখা গেল সর্বোচ্চ মুসলিম জনসংখ্যার ঘনত্ব পূর্ব বাংলা, পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশগুলোতে এবং বালুচিস্তানে। আকর্ষণীয় তথ্য হলো এই সমস্ত এলাকা না শুধু মূল মুসলিম রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রভূমি থেকে অনেক দূরে, সাথে সাথে এই এলাকাগুলো হিন্দু ব্রাহ্মণ সমাজ থেকে ও অনেক দূরে যারা মূলত গাঙ্গেয় উত্তর সমতলভূমিতে বাস করতো। ব্রাহ্মণ বর্ণবাদের প্রভাব সীমান্তবর্তী বাংলায় খুব কম। বাংলার আদিবাসী জনগোষ্ঠী কখনই ঐতিহাসিকভাবে হিন্দু বা বৌদ্ধ সমাজের অঙ্গীভূত হয়নি। বাংলায় মুসলিম ধর্মান্তরিতরা প্রধানত রাজবংশী, চণ্ডাল, কোচ এবং অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায় যারা ব্রাহ্মণবাদী সংস্কৃতির বৈষম্যের সম্মুখীন হয়েছিল। অথচ আর্যাবর্তের নিম্নবর্গীয় জনসংখ্যার অধিকাংশই যারা ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য-র দ্বারা নির্যাতিত ছিল, তারা তাদের পূর্বপুরুষের হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি। যদি তাই হত তাহলে বলা যায় যে ইসলামে ধর্মান্তরের সবচেয়ে বড় ঘটনা সেখানেই ঘটা উচিত ছিল সেখানে ব্রাহ্মণ্যবাদের শিকড় সবচেয়ে বেশি গেঁথে বসে ছিল, বিপরীতভাবে কিছু ইসলাম-ধর্মান্তর হওয়া ছাড়া এই ব্রাহ্মণ্যবাদী সভ্যতার এলাকায় তেমন কিছু ঘটেনি। অর্থাৎ যেখানে এই ব্রাহ্মণ্যবাদী সভ্যতার প্রভাব কম বা নেই সেই সমস্ত অঞ্চলে যেমন বাংলার সীমান্তবর্তী এলাকা, সুতরাং পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে ঘটেছিল।

১.৬ উপসংহার

এইভাবে যে চার রকমের তত্ত্ব আলোচনা করা হলো, আমরা দেখলাম প্রত্যেকটি তত্ত্বই সম্পূর্ণ নয়, বা বলা যায় একটি ছাড়া অন্যটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। আমরা পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারি না যে সামরিক এবং রাজনৈতিক কারণ ছিল ইসলামের ছড়িয়ে পড়ার পিছনে, বা আমরা অস্বীকার করতে পারি না পৃষ্ঠপোষকতার সূত্রও কিছুটা হলেও ইসলাম ছড়িয়ে পড়ার কারণ। আবার ইটন তাঁর বইতে দেখিয়েছেন যে মুঘল আমলেই সবচেয়ে বেশি ধর্মান্তকরণ ঘটেছিল। মুঘলরা এই কাজে তাদের সামরিক শক্তির

সাহায্যে ধর্মান্তরিতকরণ করার চেষ্টাই করেনি বরং স্থানীয় সুফি সন্ত এবং দরগাই সাহায্য করেছিল ধর্মান্তরিত করার কাজে সঙ্গে সামাজিক মুক্তির সূত্রও কাজ করেছে।

১.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. ১৮৭২ সালে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সেনসাসের ঘটনাগুলির সাথে রাজ্যের জাতিগত এবং ধর্মীয় গঠনের কী সম্পর্ক?

২. বাংলায় ইসলাম ধর্মের বৃদ্ধির পেছনে যে চারটি প্রচলিত তত্ত্ব আছে তাদের নাম লিখুন এবং সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

৩. অভিবাসনের সূত্রটি কী? কেন এই সূত্র বাংলার মাটিতে কাজ করলো না?

৪. অভিবাসন সূত্রের কারা প্রধান প্রবক্তা ছিল? এই প্রচারের পেছনে সত্যিকরের উদ্দেশ্য কী ছিল?

৫. ইসলামে গণ রূপান্তরের পেছনে তলোয়ারের দ্বারা ও পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা ধর্মান্তকরণের সূত্র দুটির বর্ণনা করুন এবং এর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে লিখুন।

৬. সামাজিক মুক্তির সূত্রটি লিখুন এবং বর্ণনা করুন বাংলায় ইসলামের প্রসার সম্বন্ধে। ঐতিহাসিক Richard Eaton এই নির্দিষ্ট সূত্রটির বিরুদ্ধে কী পাল্টা যুক্তি দেখিয়েছেন?

৭. আপনার মতে বাংলায় মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির পেছনে প্রধান কারণ কী ছিল। সঠিক যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করুন।

১.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Chandra, Satish, *History of Medieval India* (New Delhi : Orient Blackswan Pvt. Ltd. 2007).

Eaton, Richard M., *The rise of Islam and the Bengal frontier : 1204-1760* (Berkele : University of California Press 1993).

Sarkar Jadunath (ed). *A history of Bengal, Muslim period* (vol-II) (1200-1757 AD) (New Delhi, B.R. Publishing Corp. 2017).

Sengupta, Nitish, *Land of Two rivers : A history of Bengal from Mahabharata to Mujib* (New Delhi, Peyaica Books 2011).

James Wise, "*The Muhammadans of Eastern Bengal*" in journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, Part. III, No. I (1894).

একক ২ ❑ মামলুকদের অধীনে বাংলা (১২২৭-৮৭)

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য
২.১ ভূমিকা
২.২ বখতিয়ারের আক্রমণের সময়কালের বাংলা
২.৩ ইলতুতমিশের নেতৃত্বে বাংলায় দিল্লির শাসন ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা (১২২৭)
২.৪ রাজনৈতিক শাসন ক্ষমতার বিস্তার
২.৫ উপসংহার
২.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী
২.৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

২.০ উদ্দেশ্য

- বাংলায় মামলুকের অধীনে (১২২৭-১২৯০) যে ঐতিহাসিক বিবর্তন হয়েছিল আলোচ্য অংশের তাহাই বর্ণিত।
- এই অংশে আক্রমণকারী বখতিয়ার খিলজির সময়কালে বাংলার অবস্থার-র বর্ণনা।
- এই অংশে বাংলায় দিল্লির শাসন ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।
- এই অংশে সেই সময়কালের বাংলায় রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থায় প্রকৃত চিত্র বিবৃত করা হয়েছে।

২.১ ভূমিকা

আদিকাল থেকেই ইতিহাসে বাংলার নাম পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্য ‘‘ঐত্তরিয় ব্রাহ্মণ’তে এর প্রমাণ আছে, আবার মহাভারতে ‘‘বঙ্গ” রাজ্যকে কিংবদন্তি রাজা বালির পত্নী সুদেষ্ণার এক ভাই হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যাই হোক প্রত্নতাত্ত্বিক খননের সময় এখানকার মেদিনীপুর ও বর্ধমানের বিভিন্ন স্তূপে প্রাগৈতিহাসিক আমলে মানুষের বসতি ও তাদের ব্যবহৃত বাসনপত্র হদিস পাওয়া যায়, যা উত্তর ভারতে বৈদিক যুগ অগমনেরও পূর্বে। এরপরে গ্রীক এবং চিনা সূত্রেও বাংলার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। বিখ্যাত ভৌগলিক বই "Periplus of the Erithrean Sea" নিম্ন গাঙ্গেয় সমতল ভূমিকে ‘‘গঙ্গারিদাই” (Gangaridai) রাজ্য হিসাবে বর্ণনা আছে। যাইহোক, গুপ্ত পরবর্তী সময়ের বাংলা সর্বোচ্চ সমৃদ্ধির শিখরে পৌছে যায়, প্রথমে শশাঙ্ক এবং পরে পাল এবং সেন রাজাদের সময়ে।

এইরকম সময়ে বাংলার ইতিহাসে বখতিয়ার খিলজির আক্রমণে মুসলিম রাজত্ব শুরু হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পরবর্তী অংশে আমরা আলোচনা করবো মুসলিম শাসনের প্রথম দফায় অর্থাৎ তুর্কি মামলুক বংশের সময়ে বাংলার অবস্থা।

২.২ বখতিয়ার আক্রমণের সময়কালের বাংলা

১২০৪ সালে যখন মহম্মদ বখতিয়ার উত্তর পশ্চিম বাংলা অধিকার করলেন তার পূর্বে মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা কেন্দ্রীভূত বৈশ্বিক আরব খলিফার তত্ত্বের দ্বারা পুষ্ট হয়েছে আরব খলিফার অধীনে। অর্থাৎ এই মতবাদে 'খলিফা' হলেন সর্বোচ্চ ধর্মগুরু মহম্মদের উত্তরাধিকারী এবং পৃথিবীব্যাপী মুসলিম জনগণের ধর্মীয় এবং প্রশাসনিক প্রধান। এই নিয়ম অনুযায়ী গোটা বিশ্বের মুসলিম শাসিত রাষ্ট্রের শাসন সেই ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাগদাদের হাতে। কিন্তু দশম শতকের প্রথম থেকেই এই ব্যবস্থা শিথিল হতে শুরু করে, শুধু মাত্র দূরবর্তী এলাকায় পৌঁছাতে না পারার জন্য নয়, আরো উল্লেখযোগ্যভাবে কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক-ধর্মীয় নেতৃত্বের অভাবে। এর সাথে যুক্ত হয় খ্রিস্টীয় নবম থেকে এগারো শতকে বিভিন্ন তুর্কি যাযাবর শ্রেণির আগমন যারা মধ্য এশিয়া থেকে এসে আরব খিলাফতের পূর্ব সীমান্তের রাজ্যগুলোতে বসতি স্থাপন করলো। তাদেরকে খিলাফত সাম্রাজ্য প্রধানত নিয়ে এসেছিল ক্রীতদাস সৈন্য হিসাবে নিজেদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য, কারণ এই তুর্কিরা ছিল মূলতঃ যুদ্ধবাজ যাযাবর শ্রেণি। এই তুর্কিরাই খোরাসানসহ অন্যান্য প্রদেশগুলো যেমন উত্তর-পূর্ব ইরান, পশ্চিমে আফগানিস্থান ও অক্সাস নদীর (River Oxus) দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চলে স্থায়ীভাবে নিজেদের বসতি স্থাপন করলো। কালক্রমে বাগদাদ খলিফার ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে তখন এই তুর্কি যোদ্ধা শ্রেণিরা খোরাসান ও ইরান অঞ্চলে নিজেদের রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধি করে বিভিন্ন আঞ্চলিক তুর্কি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে।

১২০৪ সালে বাংলায় আগমনের কয়েক শতাব্দী পূর্বেই মহম্মদ বখতিয়ার ও তাঁর তুর্কি অনুগামীদের রাজনৈতিক ধারণা স্পষ্ট আকার খোরাসানে বিকশিত হয়েছিল। এটা সেই সময় যখন ইরানি আইনবিদরা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে খলিফা তত্ত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার কিন্তু বাস্তবে তুর্কিরা পূর্ব দিকে তাদের নিয়ন্ত্রণ দখল করে এবং আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের পতন হয়। অর্থাৎ খলিফার রাজত্বের সংশোধিত তত্ত্ব উদিত হলো, যদিও খলিফা তত্ত্বের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ধারণার পরিস্কার বিরুদ্ধাচরণ করা হলো না। অর্থাৎ ধর্মীয় কর্তৃত্ব বাগদাদের খলিফা-র হাতেই রইলো কিন্তু রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা তাদের হাতেই থাকলো যারা তরবারির দ্বারা শাসন চালাতো। তখনকার একজন শ্রেষ্ঠ মৌলভী Alue-Hamid al-Ghazali (d-1111) এর মতে একটি সরকার তখনই বৈধ যতদিন সে বাগদাদের খলিফার অধীনে তার শাসনকার্য চালাবে, তার একটি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি খলিফার তরফ থেকে থাকবে। Ghazali বললেন সাধারণের প্রার্থনার সময় খলিফার নামটি নেওয়া এবং মুদ্রার উপর খলিফার নাম মুদ্রিত করা এই স্বীকৃতির চিহ্ন। সংক্ষেপে সুলতানকে খলিফার কোনো বংশগত উত্তরাধিকার বহন করতে হবে না এবং সুলতান তার নিজস্ব ক্ষমতায় রাজ্যের নিরাপত্তা এবং প্রজাদের শাসন বজায় রাখবে।

১২০৪ সালে মহম্মদ বখতিয়ার বাংলা আক্রমণের সবচেয়ে কাছাকাছি ঐতিহাসিক বর্ণনা Minhaj al-Siraj-এর লেখাতেই পাওয়া যায়। ১২০৪ সালের ৪০ বছর বাদে তিনি বাংলায় আসেন এবং স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে ১২০৪ সালের আক্রমণের সময়কার খবর সংগ্রহ করেন। তার থেকে জানা যায়

বখতিয়ারের আক্রমণের সময় বাংলায় সেন রাজবংশের লক্ষ্মণ সেন রাজা ছিলেন এবং তার রাজধানী ছিল লক্ষণাটি/লক্ষণবতী (নদিয়া)-তে Minhaj al-Siraj-এর লেখা থেকে জানা যায় ১২০৪ সালে মুষ্টিমেয় তুর্কি ঘোড়সওয়ারের আক্রমণে লক্ষণ সেন তাঁর রাজধানী ত্যাগ করে বহুদূর পূর্ব বাংলায় বিক্রমপুরে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। সেখানে তিনি এবং তাঁর উত্তরাধিকারী বিরুপাক্ষ সেন এবং কেশব সেন বেশ কিছু বছর শাসন করেন। যদিও এই লেখার সত্যতা সম্বন্ধে বহু ঐতিহাসিক সন্দেহ প্রকাশ করেন।

Minhaj লিখেছেন যে যখন মহম্মদ বখতিয়ার প্রদেশে প্রবেশ করলেন তখন সেন রাজা নদীয়া পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। মহম্মদ বখতিয়ার লক্ষণৌটিতেই তার রাজধানী স্থাপন করে প্রদেশের সব অংশকেই তার অধীনে নিয়ে আসেন এবং খুতবা পড়ার জন্য নানা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেন। মসজিদ, দরবেশদের ভবন প্রভৃতি নির্মাণ তাঁর অন্যতম প্রশংসীয় কাজ। বখতিয়ার মুদ্রার প্রচলন করেন যা উল্লেখের প্রয়োজন।

উপরের বক্তব্য থেকে পরিস্কার বিজয়ী বাহিনী রাজনৈতিক বৈধতা সৃষ্টির জন্য সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। সেখানে জুম্বার নামাজ, মুদ্রা তৈরি, বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করে তাদের বুদ্ধিজীবী সুফি সম্প্রদায়দের জন্য, তাদের পণ্ডিত ও উলেমাদের জন্য।

মহম্মদ বখতিয়ারের সেন্যবাহিনীতে প্রায় দশ হাজার যুদ্ধবাজ ঘোড়াসওয়ার বাহিনী ছিল, যারা স্থানীয়দের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের প্রতীক ছিল। বখতিয়ার এবং তার উত্তরসুরিরা সবসময় নিজেদের ক্ষমতা জাহির করতো পরাজিত বাঙালিদের উপর। ১২০৪ সালে বখতিয়ার একটা সোনার মুদ্রা প্রকাশ করেন তার একদিকে ছিল তার দিল্লির প্রভু সুলতান মহম্মদ ঘোরীর ছবি আরেকদিকে ছিল একজন আক্রমণকারী তুর্কি অশ্বরোহির ছবি যার হাতে ছিল গদা। এই মুদ্রা তৈরি করার নেপথ্যে ছিল "Gaudoavjaye" অর্থাৎ গৌড় অথবা বাংলা বিজয়ের স্মারক এবং লেখাটা ছিল সংস্কৃতে, আরবিতে নয়। ১২১০ থেকে ১২১২ পর্যন্ত আলি মর্দান বাংলার শাসক পদে ছিলেন। বাংলার প্রশাসক নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন এবং একটি রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন করেন যাতে ঘোড়াসওয়ার-এর ছবিই মুদ্রিত ছিল। আবার দিল্লী যখন তার শাসন ক্ষমতা পুনরায় বাংলায় প্রতিষ্ঠা করলো তখন সুলতান ইলতুৎমিস (Iltutmish) (১২১০-১২৩৫) র নামে আরেকটি মুদ্রার প্রচলন হয়। মহম্মদ বখতিয়ার, আলি মর্দান বা সুলতান ইলতুতমিস কেউই কখনও বাঙালি হিন্দু সংস্কৃতি বা পরাজিত সেন রাজাদের মতো বৈধতা অর্জন করতে পারেনি। বরং নতুন শাসকরা খুব নির্দিষ্টভাবে তাদের সামরিক বলপ্রয়োগের ধারণা ছড়িয়ে দিত। Peter Hardy সেইজন্যই উত্তর ভারতে ইন্দো-তুর্কি শাসন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন “Muslim rulers were there in northern India as rulers because they were there—and they were there because they had won.”

২.৩ ইলতুৎমিসের নেতৃত্বে বাংলায় দিল্লীর শাসন ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা (১২২৭)

১২০৪-২৭ অবধি বাংলা শাসন করতো প্রায় স্বাধীন সর্দার বা প্রশাসকগণ, প্রথমে বখতিয়ার পরে তার উত্তরসুরিরা। দিল্লীর সুলতান তখন মোঙ্গল চেঙ্গিস খানের আক্রমণ প্রতিরোধ করতেই ব্যস্ত থাকতো।

চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর মোঙ্গলদের আক্রমণ অবসান হয়। দিল্লীর সুলতান পুনরায় আবার তার হারানো সাম্রাজ্য পুনরুত্থান করা শুরু করে। ১২২৭ সালে ইলতুৎমিস তার বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাংলার দিকে এগিয়ে আসেন এবং বিদ্রোহী তুর্কি সর্দার বা প্রশাসক তুঘরিল খানাদকে পরাজিত করে দিল্লীর শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন বাংলায়।

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের লেখা থেকে জানা যায় বাংলায় ৬০ বছরের তুর্কি শাসনের সময় প্রায় ১৫ জন প্রশাসক লক্ষণৌটিতে বসেছিল। এই পনেরো জনের মধ্যে অন্তত ১০ জন ছিল দিল্লী রাজদরবারের মামলুক। এই মামলুকরা নানা দেশের নাগরিক ছিল যথা মধ্য এশিয়া, খিতাই তুর্কি, কিপচেক, উজবেক। এদের প্রথম জীবন ছিল ক্রীতদাসের। এরা বাংলার প্রশাসক হওয়ার আগে দিল্লী দরবারে ক্রীতদাস থেকে ক্ষমতাশালী প্রশাসক হিসাবে উন্নত হয়েছিল। প্রশাসক হিসাবে বিভিন্ন রাজকার্যে যোগদান করে আস্থা অর্জন করেছিল এবং প্রশাসক হিসাবে নানা রাজ্যে নিযুক্ত হয়েছিল। লক্ষণৌটিতে তাদের শাসন কার্য হুবহু ছিল দিল্লীর শাসন কার্যের অনুরূপ, অর্থাৎ বাংলায় প্রশাসনিক কাজকর্ম একদম দিল্লীর প্রশাসনিক কাজকর্মের অনুকরণে সম্পন্ন হত।

২.৪ রাজনৈতিক শাসন ক্ষমতার বিস্তার

সামরিক শক্তির বহিঃপ্রকাশের চিহ্ন—এখনও টিকে যাওয়া—সেই সময়কার বাংলার মুসলিম স্মৃতিস্তম্ভগুলোতে পাওয়া যায়। দঃপশ্চিম বাংলায় কলকাতার কাছে ছোটো পাণ্ডুয়াতে একটা মিনার যেটা

Silver coin of Sultan Iltutmish (1210–35), struck in Bengal. (Obverse side).

১৩শ শতকের শেষ ভাগে তুর্কি শাসনের সময়েই বসানো হয়েছিল একটি মসজিদের পাশে যেটা তৈরি করা হয়েছিল বিজয়ী বাহিনীর স্মারক হিসাবে। তুর্কি ঐতিহাসিক স্থাপত্যের এটি একটি নজির। বাংলায় ইসলামিক শাসনের একদম প্রথম যুগের এখনও টিকে থাকা মসজিদগুলো থেকেও এই বিদেশি স্থাপত্যের চিহ্ন পাওয়া যায়। ত্রিবেণীতে ১২৯৮ সালে জাফরখানের একটা মসজিদ খনন করার পর দেখা যায় তার স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য মিলে যাচ্ছে বেগমপুর মসজিদ দিল্লীর সাথে,—সেই একই ইন্দো তুর্কি স্থাপত্য। এইসব স্থাপত্যগুলো স্পষ্টতই প্রজাদের কাছে তুর্কি রাজত্বের সার্বভৌমত্ব নির্দেশ করতো। তুর্কি বাহিনীর বাংলা বিজয়ের ৩০ বছর বাদেও সেন রাজত্ব ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করে তুর্কি আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছিল। এমনকি যখন তুর্কিরা যেসব এলাকা থেকে সরে যেতো সেখানে সেন রাজত্বের অধীনে স্থানীয় শাসনকর্তারা রীতিমত সিল্ক, গয়নাদি ভূষণে সজ্জিত হয়ে, নিজস্ব অস্ত্রধারী সৈন্য নিয়ে হাতির দাঁতের বসানো পাল্কিতে করে এসে সভা বসাতো এবং কর আদায় প্রশাসনিক কাজকর্ম ন্যায়বিচার সবই আগের মতোই করতো। ১২৩৬ সালে একজন তিব্বতি বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী জানাচ্ছেন যে বিহারে নৌকায় গঙ্গা পার হবার সময় দুজন তুর্কি যোদ্ধা তাদের থেকে সোনা দাবি করে, তীর্থযাত্রীরা সাহসের সাথে উত্তর দেয় যে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের নামে স্থানীয় হিন্দু রাজাকে জানাবে। এই হুমকিতে তুর্কি যোদ্ধারা এতই ক্ষেপে যায় যে তীর্থযাত্রীদের প্রাণসংশয়ের উপক্রম হয়। বিদেশি শক্তির অধীনে তিন দশক পেরিয়ে যাওয়ার পরও সাধারণ জনগণ ন্যায়বিচারের জন্য হিন্দু রাজাদের উপরই ভরসা রাখতো।

মুসলিম স্থাপত্য ও মুদ্রা সেই সময়ের মুসলিম একাধিপত্য দাবি করলেও বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এই তুর্কি রাজত্বের শাসনতন্ত্রের পুরোপুরি অধীনে কখনই ছিল না। সেই সময়কার বাংলার তুর্কি শাসকরা দিল্লীর সুলতান প্রভুদের একরকম বার্তা দিত, আবার বৃহত্তর মুসলিম পৃথিবীতে অন্য ধরনের বার্তা দিত। দীর্ঘ ১৩শ শতাব্দী ধরেই বাংলার প্রশাসকরা ক্রমাগত চেষ্টা করে গেছে দিল্লীর প্রভুদের থেকে দূরত্ব বাড়িয়ে রাখা এবং নিজেদেরকে স্বাধীন সার্বভৌম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং একই সঙ্গে নিজেদেরকে বৃহত্তর মুসলিম সমাজের কাছে প্রতিষ্ঠা করা। এরই উদাহরণ স্বঘোষিত সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওজ ১২১৩ সালে দিল্লীর সুলতানের থেকে নিজেকে স্বাধীন ঘোষণা করলেন এবং শুধু তাই নয় তিনি চেষ্টা করলেন নিজেকে দিল্লীর সুলতানের থেকেও অনেক উপরে, নিজেকে পৃথিবীব্যাপী ইসলামের ধর্মের রক্ষক খলিফার দক্ষিণ হস্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার এবং ভারতবর্ষের মুসলিম শাসকদের মধ্যে প্রথম কেউ দৃঢ়তার সাথে এই দাবি করলেন যে তিনি সরাসরি সর্বোচ্চ ইসলামি অনুশাসনে অর্থাৎ খলিফার অধীনে। এতে দিল্লীর শাসক ইলতুতমিস অত্যন্ত বিব্রত হয়ে বাংলা আক্রমণ করলেন এবং পুনরায় বাংলার ক্ষমতা দখল করলেন এবং খলিফার অধীনে অন্য মঞ্চ নিয়ে গেলেন। গিয়াসুদ্দিন ইওজ যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর তাঁকে বন্দি ও হত্যা করা হয় ৬২৪ হিজরি বা ১২২৬-২৭ খ্রিষ্টাব্দে। এই উপলক্ষে বাংলার রাজধানীতে একটা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় এবং ইলতুৎমিস নিজেকে খলিফার অধীনে বলে ঘোষণা করেন। আবার কিছু দিনের জন্য সমতল বাংলা উত্তর ভারত তথা দিল্লী সুলতানের অধীনে আসে এবং পরের তিরিশ বছর দিল্লীর সুলতান বিভিন্ন প্রশাসক নিয়োগ করে যারা নিজেদেরকে king of the kings of the East বা 'মালিক-উশ-শরক' বলে পরিচয় দিতেন।

এই সময় কালে যেহেতু দূরবর্তী ছিল, তাই বাংলার শাসকদের দিল্লীর সুলতানের প্রতি আনুগত্য সর্বদা বজায় থাকতো না, তাছাড়া ঐ সময় দিল্লীর সুলতানরা ব্যস্ত থাকতো ইরান মালভূমি থেকে মোঙ্গল হানাদারি রুখতে। অতএব প্রাদেশিক প্রশাসকরা মাঝে মাঝেই বিদ্রোহ করতো এবং তারা নিজেদের নামে মুদ্রা এবং ইমারত তৈরি করে স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করতো। ১২৮১ সালে দিল্লীর শক্তিশালী সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন নির্মমভাবে একজন বিদ্রোহীকে উপড়ে ফেলে তাকে প্রকাশ্যে হত্যা করেছিল। অথচ বলবন ১২৮৭ সালে মারা যাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে তারই ছেলে বুঘরা খান যাকে বলবন প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ করেছিল, সেই বিদ্রোহী হয়ে নিজেকে স্বাধীন ঘোষণা করেছিল। বুঘরার পুত্র রুকন-উদ-দীন কায়কাউস (১২৯১-১৩০০) বাংলার শাসন ক্ষমতা পেয়েছিল এবং নিজেকে 'মহান সুলতান' জাতির সর্বোচ্চনায়ক, 'রাজার রাজা' তুর্ক এবং পারস্যের, The Lord of the Crown and the Seal একই সঙ্গে 'ঈশ্বরের ডান হাত বা 'খলিফার সাহায্যকারী' রূপে ঘোষণা করে। এমন কি একটি মসজিদে সে নিজেকে বর্ণনা করলেন 'ঈশ্বরের ছায়া' (Zill Allah) যা প্রাচীন পারস্যের রাজকীয় উপমা।

দশকের পর দশক বাংলার প্রতি দিল্লীর নিয়ন্ত্রণ আস্তে আস্তে শিথিল হতে থাকে, কারণ একে নিজের নিয়ন্ত্রণ রাখতে গেলে বিশাল সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন। আসলে দিল্লীর সুলতান Jalal-all-Din Khalaji (১২৯০-৯৬)-র বাংলার প্রতি উদাসীনতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছায়। একজন সমসাময়িক ঐতিহাসিক লিখেছেন একবার সুলতান প্রায় একহাজার ডাকাত (ঠগ) ধরেন এবং নির্দেশ দেন তাদের লক্ষনৌতির কাছে ছেড়ে দিতে, যেখানে তারা স্বাধীনভাবে থাকবে যাতে তারা দিল্লী বা তার আশেপাশে কোন ঝামেলা না করতে পারে। বাংলা বিজয়ের এক শতক কাটতে না কাটতে তা দিল্লীর প্রশাসনের আবর্জনা স্থল হিসেবে পরিচিত হলো, অথচ যে বাংলা ছিল দিল্লীর সম্রাটের মাথার মুকুট, যেখানে সোনার স্মারক মুদ্রা মুদ্রিত হত। ইতিমধ্যে সমতল বাংলা উত্তর ভারতীয় শাসকদের চক্ষুশূল হয়ে উঠলো এবং এটা চলতেই থাকলো সেটা মুঘল আমলেও বজায় রইলো ষোড়শ শতকের শেষভাগ অবধি।

২.৫ উপসংহার

ত্রয়োদশ শতকে সূচিত হলো বাংলার ইতিহাসে একটি নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়। বখিতয়ারের আক্রমণের পর প্রথম দু দশক তারই মনোনীত কর্মচারীরাই প্রশাসক হিসাবে নিয়োজিত হয়েছিল। ইলতুতমিস-এর সময় থেকেই বাংলা প্রদেশ হিসাবে পুনঃ গঠন হয় এবং দিল্লীর সুলতানের অধীনস্থ হয়। যদিও, প্রকৃত অর্থে কেন্দ্রীয় শাসন ছিল না। মামলুক, ইক্তাদার এবং প্রশাসকরা বাংলায় যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করতো এবং সময়ে সময়ে দিল্লীর দরবারে কিছু উপঢৌকন পাঠিয়েই দায়মুক্ত হত। তুর্কিদের সময়ে ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী রাজনৈতিক শাসন চালু ছিল এবং প্রদেশের বিভিন্ন অংশে প্রচুর ইসলামি স্থাপত্য তৈরি করা হয়েছিল যা সাধারণ প্রজাদের সামনে রাজনৈতিক প্রতীক হিসাবে প্রকাশিত হয়।

২.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. বখতিয়ার খিলজির বাংলা আক্রমণের (১২০৪) পটভূমি ও তাৎপর্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখুন।

২. সুলতান ইলতুৎমিস্ কীভাবে বাংলায় দিল্লীর সুলতানের শাসন ব্যবস্থা পুনঃগঠন করলেন? কী কী কারণে এই পুনঃগঠন প্রক্রিয়া বিলম্ব হলো?

৩. বাংলায় মামলুকের রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ কীভাবে কাজ করতো তার একটি সাধারণ বর্ণনা দিন।

৪. মামলুক বাংলায় শাসন কার্যে কি ইসলামের রাজনৈতিক আদর্শ আধিপত্যই প্রধান ছিল? আপনার যুক্তির পক্ষে কারণগুলো লিখুন।

২.৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Ali, Mohammad Mohar, *History of the Muslims in Bengal* (vol-I) (Riyadh : Imam Md. Ibn Saud Islamic University, 1985).

Chandra, Satish, *History of Medieval India* (N. Delhi : Orient Blackswan Pvt. Ltd. 2007).

Sarkar, Jadunath (ed), *A History of Bengal Muslim Period* (Vol-II) (1200-1757 AD) (N. Delhi, B. R. Publishing Corp., 2017).

করিম, আবদুল, *বাংলার ইতিহাস : মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত, ১২০০-১৮৫৭ খ্রি.* (ঢাকা, ১৯৯৯)।

করিম আবদুল, *বাংলার ইতিহাস : সুলতানি আমল* (ঢাকা, ২০০৭)।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র, *বংলাদেশের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যযুগ),* (ঢাকা, ২০১৭)।

একক ৩ ❑ ইলিয়াস শাহি রাজবংশের অধীনে বাংলা

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ ভূমিকা

৩.২ ইলিয়াস শাহি (১৩৪২-৫৮) রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ও শাসন

৩.৩ ইলিয়াস শাহি-র (১৩৪২-১৪১৫) উত্তরাধিকারীরা

৩.৪ রাজা গণেশের নেতৃত্বে হিন্দু শাসনের একটি স্বল্প-মেয়াদি পর্যায়

৩.৫ দ্বিতীয় ইলিয়াস শাহি রাজবংশ (১৪৩৫-৮৭)

৩.৬ অর্থনীতি

৩.৭ উপসংহার

৩.৮ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

৩.৯ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৩.০ উদ্দেশ্য

- বর্তমান অংশের উদ্দেশ্য ইলিয়াস শাহের অধীনে বাংলার সাধারণ ঐতিহাসিক বিকাশ অধ্যয়ন করা।
- এই অংশে বাংলায় ইলিয়াস শাহের (১৩৪২ থেকে ১৩৫৮) শাসনের সূচনা নিয়ে আলোচনা।
- ইলিয়াস শাহের উত্তরাধিকারীগণ সহ রাজা গণেশের শাসন নিয়ে আলোচনা।
- শিক্ষার্থীরা এই অংশে বাংলায় সেই সময়কার অর্থনীতির বিকাশ সম্বন্ধে শিখবেন।

৩.১ ভূমিকা

চতুর্দশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে নানাবিধ আভ্যন্তরীণ কারণে এবং ভারতে তৈমুরলঙের আক্রমণের ফলে (১৩৯৮) দূরবর্তী প্রদেশগুলোর উপর দিল্লীর নিয়ন্ত্রণ শিথিল হতে শুরু করে। বেশ কয়েকটি প্রাদেশিক প্রশাসক ও সর্দার যেমন— রাজপুতানা, মুলতান, জৌনপুর, গুজরাট, মালওয়া প্রভৃতি এই সময় সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং দিল্লীর সুলতানের থেকে তারাও স্বাধীনতা ঘোষণা করে। পরবর্তী সময়ে এই স্বাধীন প্রদেশগুলো নিজেদের মধ্যে তাদের সীমানা নিয়ে গণ্ডগোল জড়িয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে তাদের নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য গড়ে উঠে। পূর্বে বাংলায় ইলিয়াস শাহের সুলতানের অধীনে নতুন স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ গঠিত হয়।

৩.২ ইলিয়াস শাহি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ও শাসন (১৩৪২-৫৮)

ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য বাংলা দিল্লীর থেকে দূরবর্তী অঞ্চল ছিল এবং বাস্তবিক এর যাতায়াতের বৈশিষ্ট্য জলপথের উপর নির্ভর করতো যেটা তুর্কি শাসকদের কাছে অপরিচিত ছিল, ফলে বাংলা সবসময়ই সুলতানিয়েতের থেকে স্বাধীন অবস্থান উপভোগ করতো।

১৩৩০ খ্রি: থেকে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলুক নানা ধরনের বিদ্রোহ দমন করতে ব্যস্ত থাকতো। তাঁর রাজত্বকালে ১৩৩৮ সালে গুরুতর বিদ্রোহ শুরু হয় দোয়াব অঞ্চলে এবং উত্তরে সমতলভূমি অঞ্চলে। এই উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দিল্লীর সুলতানের বাংলার উপর নিয়ন্ত্রণ আরও শিথিল হয়ে পড়ে। এরই সুযোগ নিয়ে সামসুদ্দিন ইলিয়াস খান নামে একজন নেতৃস্থানীয় তুর্কি অভিজাত প্রাদেশিক রাজধানী লক্ষণৌটি আর সোনারগাঁও অধিকার করে এবং নিজেকে স্বাধীন হিসাবে ঘোষণা করে

Comparative Location of the Bengal Sultanate under Iliyash Shahis (c. 1450)

সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহি উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আসীন হন। এরই সাথে সাথে বাংলায় প্রথম স্বাধীন মুসলিম রাজবংশ ক্ষমতায় আসীন হয়।

সিংহাসনে আরোহণ করেই ইলিয়াস শাহি তাঁর রাজত্ব পশ্চিমে আধুনিক উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। এর ফলে তুঘলক বংশের উত্তরাধিকারী সুলতান ফিরোজ শাহি তুঘলুক (১৩৫১-৮৮) ইলিয়াস শাহি সুলতানের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। দিল্লীর সুলতানের সৈন্যবাহিনী পূর্ব বিহার দিয়ে এগিয়ে আসে এবং বাংলার পুরনো রাজধানী পান্ডুয়া ১৩৫৩ সালে অধিকার করে। ইলিয়াস শাহি একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন এবং সেখান থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যান। ইলিয়াস শাহিকে পরাজিত করার অনেকগুলি ব্যর্থ চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত ফিরোজ শাহি শান্তিচুক্তি করেন ইলিয়াস শাহের সঙ্গে। এই শান্তি চুক্তি অনুযায়ী বিহারের কোশি নদীকে সীমানা হিসাবে নির্ধারণ করা হয় দিল্লী এবং সুলতান ইলিয়াস শাহির বাংলার মধ্যে। পরবর্তী সময়ে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং দুজনের মধ্যে নিয়মিত উপহার বিনিময় হত। ইলিয়াস নিজের কাজের প্রতি যত্নবান ছিলেন। তিনি নিয়মিত স্বাধীনভাবে ব্যবহার করার জন্য অভিজাত এবং মুসলিম মৌলবিদের জমি দান করতেন। ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্রের মতে সুলতান ফিরোজ শাহের বাংলায় না জেতার পেছনে ইলিয়াস শাহের জনপ্রিয়তাই প্রধান কারণ। ফিরোজ তুঘলুক অনেকবার চেষ্টা করেছিলেন স্থানীয় মানুষদের উপর নিয়ন্ত্রণ করতে কিন্তু পারেননি। ইলিয়াস শাহের আমলে বাংলায় মুদ্রা ব্যবস্থার বিকাশ হয়েছিল এবং নির্দিষ্ট কিছু স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি হয়েছিল।

৩.৩ ইলিয়াস শাহের উত্তরাধিকার (১৩৫৮-১৪১৫)

সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের পরে তার ছেলে সিকান্দর শাহি (১৩৫৮-৮৯) সিংহাসনে বসেন। তার রাজত্বকালে ফিরোজ শাহি তুঘলুক দ্বিতীয়বার চেষ্টা করেন বাংলা জয় করার; সিকান্দর তাঁর বাবার মতো একই কৌশল অবলম্বন করেন একডালা দুর্গে আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যান। সুলতান সিকান্দর শাহিকে পরাজিত না করতে পেরে ফিরোজ শাহি আরও একবার শুধু হাতে দিল্লী ফিরে যান। এটাই বাংলার বিরুদ্ধে দিল্লির সুলতানের আক্রমণের শেষ চেষ্টা ছিল যতদিন না শের শাহ সুরি ১৫৩৮-র শেষভাগে বাংলা দখল করেছিলেন। সিকান্দর ৩০ বছর রাজত্ব করেছিলেন এবং বিখ্যাত আদিনা মসজিদ তৈরি করেছিলেন পান্ডুয়াতে ১৩৬৮ সালে আর গৌড়ে তৈরি করেছিলেন কোতয়ালি দরওয়াজা।

এই বংশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সুলতান ছিলেন সিকান্দর শাহের পুত্র সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহি (১৩৮৯-১৪১০)। তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন বাংলার সঙ্গে চিনের কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরায় স্থাপন করার জন্য, যেটা পাল-সেন রাজবংশের সময় ছিল। গিয়াসুদ্দিন তার নিজের উদ্যোগে একটি কূটনৈতিক মিশন চিনের মিং সম্রাটের সভায় পাঠিয়েছিলেন। এর প্রত্যুত্তরে চিনের সম্রাট নিজে উদ্যোগী হয়ে মা হুয়ান-এর অধীনে এক চিনা প্রতিনিধিদলকে বাংলার দরবারে পাঠান ১৪০৯ সালে। নিয়মিত উপহার সামগ্রী বিনিময় হতে থাকে দুই রাজ পরিবারের মধ্যে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী-দের বেজিং-এর সভায় পাঠানো হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রায় ২০০ বছর পর আবার বাংলা আর চিনের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়। এরই ফলশ্রুতি, পূর্ব বাংলার চট্টগ্রাম বন্দর বাণিজ্যের জন্য সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে

আরো বলা দরকার যে শুধু চিনের সঙ্গে নয়, সাধারণভাবে সূদর পূর্বদিকের দেশগুলির সঙ্গেও বাণিজ্যের মাধ্যমে যোগাযোগ গড়ে ওঠে। এটা হয়ে ওঠে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকারী বন্দর যেখান থেকে চিন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রফতানি করতো।

এছাড়া, আজম শাহি বিখ্যাত ছিলেন তার ন্যায়বিচারের জন্য, তার গোটা রাজ্যে তিনি তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন কাজিদের উপর যাতে তাদের দিক দিয়ে কোন অসদাচরণ না হয়। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষিত মানুষ। তিনি খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন এশিয়ার সমসাময়িক শিক্ষিত মানুষদের সাথে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইরানের কবি হাফিজ।

আজম শাহ মারা যাওয়া পর আরও চারজন পরপর ইলিয়াস শাহি সুলতানে সিংহাসনে বসেছিলেন, যথাক্রমে হামাজ শাহ, মহম্মদ শাহ, বাইজিদ্ শাহ এবং ফিরোজ শাহ ১৪১৫ সাল অবধি। যদিও এদের কারও সম্বন্ধে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা সম্বন্ধে জানা যায় না।

৩.৪ রাজা গণেশের নেতৃত্বে হিন্দু শাসনের একটি সংক্ষিপ্ত

১৪১৫ সালে রাজনৈতিক বিভ্রান্তি এবং ইলিয়াস শাহি রাজবংশের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দিনাজপুরের রাজা গণেশ শাহি রাজবংশকে উৎখাত করে। তিনি মূলত ইলিয়াস শাহি রাজবংশের একজন নেতৃস্থানীয় অভিজাত ছিলেন। স্পষ্টতই রাজ্যের নেতৃস্থানীয় উলেমা এবং সুফিরা একজন অমুসলিমকে শাসক হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকার করে। সেই কারণে তারা পার্শ্ববর্তী জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম আলি সারকিকে আমন্ত্রণ করে বাংলাকে আক্রমণ করে অমুসলিমের শাসন থেকে মুক্ত করতে। দুই পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং শীঘ্রই তারা আলোচনা শুরু করে। নেতৃস্থানীয় সুফি নূর-কুতুব-ই-আলম-এর মধ্যস্থতায় এবং ঠিক হয় রাজা গণেশের ১২ বছর বয়সি সন্তান যদু মুসলমান ধর্মে পরিবর্তিত হবে এবং নতুন নাম হবে জালালউদ্দিন। এরপর ইব্রাহিম সারকি জৌনপুরে ফিরে যান।

যদিও রাজা গণেশ এরপরেও ১৪১৮ সালে তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত রাজত্ব চালিয়ে যান। তাঁর মৃত্যুর পর তার ধর্মান্তরিত পুত্র সুলতান জালালউদ্দিন শাহি নাম ধারণ করে সিংহাসনে বসেন এবং ১৪৩১ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। শেষ পর্যন্ত রাজা গণেশ রাজবংশের সমাপ্তি হয় এবং দ্বিতীয় ইলিয়াস শাহি রাজবংশ সূচনা হয়।

৩.৫ দ্বিতীয় ইলিয়াস শাহি রাজবংশ (১৪৩৫-৮৭)

সামসুদ্দিন আহমেদের মৃত্যুর পর ইলিয়াস শাহি রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন তারই বংশধর মাহমুদ শাহি এবং তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন, সামসুদ্দিন মহম্মদ শাহি নামে ১৪৩৫ সালে।

দ্বিতীয় ইলিয়াস শাহি শাসকদের মধ্যে রুকুনুদ্দিন বারবাক শাহ (১৪৫৯-৭৪) আফ্রিকান এবং ইথিউপিয়ান ক্রীতদাসদের নিয়ে একটা সামরিক বাহিনী তৈরি করে, এরাই হাবসি নামে পরিচিত হয়, এই হাবসি সৈনিক এবং আরবি সৈনিকদের তার দেহরক্ষী হিসাবে নিযুক্ত হয়। এইভাবে তাঁর রাজত্বকালে

পশ্চিম এশীয়দের বাংলায় আগমন ঘটে। যাদের সামরিক নানা পদে নেওয়া হয়। বারাবাকের সৈন্যবাহিনী পূর্বে কামরূপ, পশ্চিমে পূর্ণিয়া আক্রমণ করে এবং খুলনা-যশোরের বড় অংশে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে।

১৪৮৭ সালে এই বংশের শেষ সুলতান জালালউদ্দিন ফতে শাহ তাঁর রাজপ্রসাদ রক্ষী একজন হাবসি সেনানায়কের হাতে নিহত হন। সুলতান শাহাজাদা নামে এই সেনানায়ক সুলতান শাহাজাদা বারবাক শাহি উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন, এরই সাথে সাথে বাংলায় ইলিয়াস শাহি রাজবংশের সমাপ্তি ঘটে। ইলিয়াস শাহের সৈন্যবাহিনী প্রায়ই পার্শ্ববর্তী আসামের কামতাপুরি রাজ্য ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অনুপ্রবেশ এবং লুণ্ঠন করতো এবং প্রায় গৌহাটি অবধি তারা পৌঁছে যেতো। কিন্তু কামতা সৈন্যবাহিনী খুব কঠিন প্রতিরোধ করতো এবং তাদের বেশির ভাগ হারিয়ে যাওয়া অঞ্চলই তারা উদ্ধার করেছিল ইলিয়াস শাহের হাত থেকে। সুলতান ইলিয়াস শাহের সময়ে বাংলার রাজধানী গৌড় এবং পাণ্ডুয়া খুব সুন্দর সুন্দর ভবনে শোভিত ছিল। এটা নতুন করে বাংলার নিজস্ব স্থাপত্য রীতি জন্ম দিয়েছিল সেটা যথেষ্ট স্বতন্ত্র ছিল দিল্লী বা উত্তর ভারতীয় স্থাপত্য থেকে। সুলতানরা বাংলা ভাষার অনুরাগী ছিলেন এবং বহু বাঙালি কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, এদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ কবি মালধর বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি শ্রীকৃষ্ণ বিজয় লেখার জন্য সুলতানের থেকে 'গুণরাজ খান' উপাধি পান, আবার তার ছেলে উপাধি পান 'সত্যরাজ খান'।

৩.৬ অর্থনীতি

বাংলার সুলতানের অর্থনীতি মূলত দিল্লী সুলতানের উত্তরাধিকার সূত্রেই প্রাপ্ত, যথা—ট্যাকশাল, বেতনভোগী আমলাতন্ত্র এবং ইজরাদারী পদ্ধতিতে জমির মালিকানা। রৌপ্য মুদ্রার উপর বাংলার সুলতানের নামে মুদ্রিত হত, সেটা বাংলার স্বাতন্ত্রের চিহ্ন। খাঁটি এবং টেকসই রৌপ্য মুদ্রা বানানোতে দিল্লীর এবং অন্যান্য এশিয়া ইউরোপ দেশগুলোর থেকেও বাংলা ছিল অধিক সফল। রুপো পাওয়ার তিনটি সূত্র পদ্ধতি সম্বন্ধে জানা যায়, প্রথম সূত্র ছিল পূর্ববর্তী রাজবংশ থেকে প্রাপ্ত রুপো। দ্বিতীয় সূত্র ছিল অর্ধস্তন রাজাদের শ্রদ্ধাপূর্বক পাঠানো রুপো, তৃতীয় সূত্র ছিল বাঙলার সৈন্যবাহিনী দ্বারা প্রতিবেশী রাজ্যে লুণ্ঠন দ্বারা প্রাপ্ত রুপো।

বাংলার অর্থনীতিতে প্রথম স্পষ্ট প্রাণবন্ততা লক্ষ্য করা গেল পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে যখন দিল্লীর সুলতানদের নজরানা পাঠানো বন্ধ হলো, সেটা সম্ভব হয়েছিল বাংলা স্বাধীন হওয়ার পরে যখন সম্পদের প্রবাহ বন্ধ করা গেলো। মা হুয়ানের লেখা সাক্ষ্য দেয় যে বাংলায় উন্নতমানের জাহাজ তৈরির কারখানা ছিল, যা প্রমাণ করে বাংলা সামুদ্রিক বাণিজ্যে সমৃদ্ধ ছিল। সেই সময় রেশমচাষ, মসলিনের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অন্যান্য শিল্প, মা হুয়ানের তালিকায় পাওয়া যায় যা চিনে রফতানি হত বাংলা থেকে। বাংলা এবং চিনের বাণিজ্যবহর একই সাথে সমুদ্রে অবস্থান করতো যতদিন না চিন তাদের বাণিজ্য জাহাজ পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ ফিরিয়ে নেয়। ভারত মহাসাগর থেকে নানা ইউরোপিয়ান ভ্রমণার্থী যথা Ludovico di varthema Durate Barbosa এবং Tone Pires তাঁদের বইতে লিখে গেছেন সেই সময় মালাক্কা

প্রণালীতে ধনী বাঙালি ব্যবসায়ী এবং বাঙালি জাহাজ মালিকদের দেখা পাওয়া যেতো। ঐতিহাসিক Rila Mukherjee লিখেছেন হয়তো বাঙলার বন্দরগুলোর মধ্যে অনেক প্রবেশ বন্দর ছিল যেখানে জিনিসপত্র আমদানি করা হত এবং পরে তা চিনে রফতানি করা হত।

বাংলায় নদীকেন্দ্রিক একটা শক্তিশালী সমৃদ্ধ জাহাজ নির্মাণ ও সারানোর ঐতিহ্য ছিল। গাঙ্গেয় অববাহিকায় সুলতানের নৌবাহিনীর অভিযান এই শক্তিগুলি জাহাজ নির্মাণ ও সারানোর ঐতিহ্যই প্রমাণ করে। মালদ্বীপ ও বাংলার মধ্যে প্রধানত চাল ও গোরুর বাণিজ্য হত, হয়তো আরব ধরনের বাগলাহ জাহাজে। চিনা সূত্র মতে বাঙালির জাহাজ প্রধানত দক্ষিণএশিয়ার সাগরেই দেখা যেতো। বাংলার জাহাজগুলি বাংলা থেকে ব্রুনেই, সুমাত্রা হয়ে আবার বাংলায় ফিরে আসতো। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সমুদ্রে কয়েক শতাব্দী ধরে ভেসে বেড়ায় বাংলার জাহাজ যা ছিল সেই সময়কার সবচেয়ে বড় জাহাজ।

সমস্ত বড় ধরনের বাণিজ্যিক লেনদেন রুপোর টাকাতে হত। ছোটখাটো লেনদেনে কড়িতে ব্যবহার হত। এক রৌপ্য মুদ্রা = ১০,২৫০ কড়ি। বাংলা জাহাজ বাণিজ্যে মালদ্বীপ থেকে কড়ি রফতানি করতো বাংলার উর্বর জমির জন্য নানা ধরনের কৃষিজাত পণ্য প্রচুর পরিমাণে জন্মাতো, যথা কলা, কাঠাল, ডালিম, আখ এবং মধু। দেশীয় ফসল চাল এবং তিল। সবজির সাথে আদা, সর্ষে, পেয়াঁজ এবং রসুনও ছিল। চার রকমের মদ আর সাথে নারকেল, চাল, আলকাতরা প্রভৃতি। বাংলার রাস্তায় নানা খাবারের দোকান থাকতো, জল খাওয়ার জায়গা এবং শৌচাগারও থাকতো। অন্তত ছয় ধরনের সূক্ষ্ম মসলিন পাওয়া যেতো, সিল্কের কাপড়ও পাওয়া যেতো। ডাল, পাট, ঘি ছিল অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পণ্য। বাংলায় তুঁত গাছের কাণ্ড দিয়ে সেরা জাতের কাগজ তৈরি হত। এই সেরা জাতের কাগজের সঙ্গে হালকা মসলিনের কাগজের তুলনা করা হত।

৩.৭ উপসংহার

মধ্যযুগের শেষভাগে বাংলায় ইলিয়াস শাহি রাজবংশ ছিল প্রথম স্বাধীন তুর্কি রাজবংশ যারা ১৪০০ থেকে ১৫০০ শতক অবধি রাজত্ব করেছিল। এটা ১৩৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ১৪৮৭ অবধি টিকে ছিল, দু একবার সংক্ষিপ্ত বিরতি ছাড়া। বাংলার পৃথক ও স্বতন্ত্র সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচিতি এই সময়কালে গড়ে উঠেছিল।

৩.৮ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. বাংলায় ইলিয়াস শাহি বংশের ইতিহাস সংক্ষেপে লিখুন।

২. ইলিয়াস শাহি সুলতানের প্রতিষ্ঠা এবং ফিরোজ শাহি তুঘলুকের সাথে প্রাথমিক সংঘর্ষের বিবরণ দিন।

৩. সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহির প্রধান কৃতিত্ব কী ছিল (১৩৮৯-১৪১৯)?

৪. রাজা গণেশ ও তার উত্তরাধিকার সম্বন্ধে লিখুন।

৫. দ্বিতীয় ইলিয়াস শাহি রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কীভাবে ঘটেছিল?

৬. ইলিয়াস শাহি সুলতানের সময় বাংলার অর্থনীতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৩.৯ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Ali, Mohammad Mohar, *History of the Muslims in Bengal* (vol-I) (Riyadh : Imam Md. Ibn Saud Islamic University, 1985).

Chandra, Satish, *History of Medieval India* (N. Delhi : Orient Blackswan Pvt. Ltd. 2007).

করিম, আবদুল, *বাংলার ইতিহাস : মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত, ১২০০-১৮৫৭ খ্রি.* (ঢাকা, ১৯৯৯)।

করিম আবদুল, *বাংলার ইতিহাস : সুলতানি আমল* (ঢাকা, ২০০৭)।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র, *বংলাদেশের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যযুগ)*, (ঢকা, ২০১৭)।

একক ৪ ❑ হুসেন শাহি রাজবংশের সময়কালীন বাংলা

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য
৪.১ ভূমিকা
৪.২ প্রতিষ্ঠা ও উৎস
৪.৩ আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজত্বকাল (১৪৯৪-১৫১৯)
৪.৪ আলাউদ্দিন হুসেন শাহের উত্তরাধিকারীবর্গ ও সাম্রাজ্যের পতন
৪.৫ পর্তুগিজদের আগমন
৪.৬ উপসংহার
৪.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী
৪.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৪.০ উদ্দেশ্য

- বর্তমান অংশে বাংলায় হুসেন শাহি রাজত্বের ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।
- এই অংশে শিক্ষার্থীরা জানবে মধ্যযুগের বাংলায় হুসেন শাহি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ও উৎস।
- এই অংশে জানা যাবে আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজত্বকাল এবং তার উত্তরাধিকারীদের সম্বন্ধে, একইসঙ্গে সাম্রাজ্যের পতন সম্বন্ধে।
- এই অংশে আরও জানা যাবে বাংলায় পর্তুগিজদের আগমন।

৪.১ ভূমিকা

ইলিয়াস শাহি রাজবংশ পতনের পর, হুসেন শাহি রাজবংশ বাংলায় রাজত্ব করে ১৪৯৪ থেকে ১৫৩৮ অবধি। যদিও তারা ইলিয়াস শাহের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী নয়, তবুও হুসেন শাহিকেই বিবেচনা করা হয় বাংলায় স্বাধীন নবাবদের মধ্যে যোগ্যতম যার রাজত্বকালে বাংলায় সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হয়েছিল।

৪.২ প্রতিষ্ঠা ও উৎস

ইলিয়াস শাহি বংশের বারবাক শাহি (১৪৫৯-৭৪) তার সৈন্যবাহিনীতে প্রচুর সংখ্যক ইথিওপিয়ান/হাবসি ক্রীতদাসদের নিয়োগ করেন রাজপ্রাসাদের প্রহরী হিসাবে। ফলস্বরূপ ১৪৮৭ সালে ইথিওপিয়ান প্রহরী দ্বারাই বাকি সৈন্যবাহিনী আক্রান্ত হয়, এই ইথিওপিয়ান সৈন্যবাহিনী ইলিয়াস শাহি রাজবংশের নবাব শাহাজাদা বারবাক শাহকে পরাস্ত করে ইলিয়াস শাহি রাজবংশের পতন ঘটায় এবং নিজেরা

বাংলার শাসন ক্ষমতা অধিকার করে। এর পর ৭ বছর বাংলা শাসন করে এই ইথিওপিয়ান বা হাবসিরা। অবশেষে ১৪৯৪ সালে একজন অভিজাত আরব এই হাবসিদের পরাজিত করেন এবং সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহি উপাধি ধারণ করে বাংলার সিংহাসনে বসেন।

হুসেন শাহির আসল নাম ছিল সৈয়দ হুসেন। ১৭৮৮ সালের "Riyaz-us-Salatin" ক্রনিকল অনুযায়ী হুসেন ছিলেন মক্কার একজন শরিফ সৈয়দ আশরফি-র সন্তান এবং তুর্কিস্থানের অধিবাসী। এছাড়া দুজন ঐতিহাসিক Salim (Riyaz-us-Salatin)-র লেখক এবং Firistha (১৬০০ শতকের শেষভাগে) তাকে "সৈয়দ" হিসাবেই উল্লেখ করেছেন, যার অর্থ হুসেন আরব বংশোদ্ভুত। হুসেন শাহি ক্ষমতা অধিগ্রহণ করার সময় ছিলেন সুলতান মুজাফ্ফর শাহের উজির, বাংলার শেষ হাবসি শাসক। কিন্তু এটা জানা যায় না তিনি বাংলায় কী করে এবং কবে এসেছিলেন এবং কীভাবে সুলতান মুজাফ্ফর শাহের উজির পদ অধিগ্রহণ করেছিলেন। যতদূর সম্ভব উনি প্রথম মুর্শিদাবাদ জেলার চন্দ্রপাড়া গ্রামে বাস করতে আরম্ভ করেন। কারণ চন্দ্রপাড়া গ্রামের চারপাশে হুসেন শাহের অনেক শিলালিপি পাওয়া যায় এবং হুসেন শাহি ঐ এলাকায় ১৪৯৪ সালে খেরুর মসজিদ তৈরি করেন। প্রথম দিকে তিনি বিদ্রোহীদের প্রতি গোপনে সমর্থন দিতেন শেষে তিনি খোলাখুলিভাবে বিদ্রোহীদের প্রধান হয়ে মুজাফ্ফর শাহ যে দুর্গে অল্প দু-এক হাজার সৈন্য নিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন সেটা অবরোধ করলেন। ১৬শ শতকের ঐতিহাসিক নিজামুদ্দিন-র মত অনুযায়ী হুসেন শাহি রাজপ্রাসাদের প্রহরীদের সাহায্যে সুলতানকে হত্যা করেন, এবং বাংলায় হাবসিদের শাসন শেষ হয়। সিংহাসনে বসার সাথে সাথে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে যাতে আর ভবিষ্যতে কোনো হাবসি অভ্যুত্থান না ঘটে, তিনি রাজপ্রাসাদের সমস্ত হাবসিদের সরিয়ে বাঙালি হিন্দু এবং তুর্কি এবং আরব বংশোদ্ভূত মুসলিমদের নিয়োগ করেন। এইভাবেই হুসেন শাহি দৃঢ়ভাবে বাংলায় রাজত্ব আরম্ভ করেন।

৪.৩ আলাউদ্দিন হুসেন শাহি-র রাজত্বকাল (১৪৯৪-১৫১৯)

আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সময়ই বাংলার সুলতানি রাজবংশের সবচেয়ে উজ্জ্বল সময় বলে মনে করা হয়। এই সময় রাজনৈতিকভাবে বাংলার সার্বভৌমত্ব বজায় রাখা ছাড়াও চেষ্টা করা হয়েছিল বাংলার সীমানা বৃদ্ধির। স্বৈরাচারী দিল্লির সুলতান সিকান্দর লোদীর আক্রমণ থেকে জৌনপুরের সুলতান শারিক-কে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং পরে পূর্ব বিহারের সীমানা সংক্রান্ত শান্তিচুক্তিও সম্প্রদান করেছিলেন।

এদিকে দক্ষিণ সীমান্তে ওড়িশার গজপতি রাজা আক্রমণ করেন। "মাদলা পাঁজি (জগন্নাথ মন্দিরের ক্রমপঞ্জিকা) অনুযায়ী আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সেনাপতি শাহ ইসমাইল গাজি মান্দারন দুর্গ (এখনকার হুগলি জেলা) থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে ওড়িশার দিকে অগ্রসর হয়ে ১৫০৮-৯ পুরী অবধি পৌঁছে যান এবং যাওয়ার পথে জাজনগর এবং কটকে অভিযান করেন। গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্রদেব সেই সময় দক্ষিণে সামরিক অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন। খবর পাওয়া মাত্র তিনি ফিরে আসেন এবং আক্রমণকারী বাংলার সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং তাদের তাড়া করে বাঙলা সীমান্ত অবধি পৌঁছে যান। তিনি মান্দারন দুর্গ অবরোধ করেন কিন্তু দখল করতে পারেন নি। হুসেন শাহের পুরো রাজত্বকালে বাংলা ও ওড়িশার সীমানায় দুপক্ষের সৈন্যবাহিনীর শত্রুতা লেগেই থাকতো।

দঃ পূর্বে হুসেন শাহি বাংলার সীমানা চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম) বন্দর অবধি বিস্তৃত করেন এবং দঃ পূর্ব উপকূল থেকে আরাকানদের হটিয়ে দেন। কিন্তু উপুর্যপুরি আক্রমণ করেও ত্রিপুরা দখল করতে ব্যর্থ হন। 'রাজমালা' (রাজ ক্রমপঞ্জিকা ত্রিপুরা) অনুযায়ী হুসেন শাহের সৈন্যবাহিনী চারবার ত্রিপুরা আক্রমণ করে কিন্তু রাজা ধান্যমাণিক্য এবং তার উত্তরাধিকারীরা প্রবল প্রতিরোধে ত্রিপুরার কোন অংশই দখল করতে পারেননি কিন্তু খাওয়াস খানের সোনারগাঁও (১৫১৩) লিপি অনুযায়ী এবং আধুনিক পণ্ডিতদের লেখা থেকে জানা যায় হুসেন শাহি ত্রিপুরার কিছুটা অংশ দখল করেছিল।

উঃ পূর্বে হুসেন শাহি মিত্র অহম রাজাদের সাথে একযোগে কামতাপুরি রাজত্ব (এখনকার কোচবিহার) আক্রমণ করেন এবং রাজধানী কামাতাপুরে বর্বর ধ্বংসলীলা চালান, মন্দির লুটপাঠ এবং কামাতাপুরে আফগান মুসলিমদের বসতি স্থাপন করেন। এর পরেই অহোম রাজাদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়। দুজনের মধ্যে তিক্ততার সম্পর্ক শুরু হয় এবং তা হুসেন শাহি এবং তার উত্তরাধিকারীদের সময়েও বজায় থাকে।

সামাজিক সাংস্কৃতি প্রেক্ষাপটে আলাউদ্দিন হুসেন শাহিকে বাংলার আকবর বলা হয়। আগেই বলা হয়েছে, সিংহাসনে বসার কিছু দিনের মধ্যেই তিনি রাজ দরবারে সরকারি পদে ইথিওপিয়ানদের নিয়োগ বন্ধ করেদেন, যাতে পুনরায় আবাসানিয়দের উত্থান না হয়। বরং আশ্চর্যরকম উদারতা দেখিয়ে সমস্ত রাজকীয় সরকারি পদগুলো পূর্ণ করেন হিন্দু এবং মুসলিম প্রজাদের তাদের নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী। এর ফলে হুসেন শাহির সময়ে প্রচুর সংখ্যক হিন্দুরা প্রশাসনের মূল পদে অধিকার করেছিলেন। তার ফলে রাজার প্রধান বা মুখ্য সচিব, রাজ বৈদ্য, টাঁকশালের প্রধান এবং মুখ্য নিরাপত্তা রক্ষী সবাই হিন্দু। দুজন বিখ্যাত বৈষ্ণব ভাই রূপ গোস্বামী আর সনাতন গোস্বামী রাজকীয় উচ্চপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। রূপ গোস্বামী ছিলেন সরকার মল্লিক, সনাতন গোস্বামী হলেন দবার-ই-খাস এবং জগাই আর মধাই নিযুক্ত হলেন নবদ্বীপের কোতোয়াল হিসাবে। গোপীনাথ বসু হলেন মন্ত্রী, মুকুন্দদাস ছিলেন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক। কেশবখান ছত্রি ছিলেন রাজকীয় নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান এবং অনুপ বলে একজন ছিলেন টাঁকশালের প্রধান। বিজয়গুপ্তের তথ্য অনুযায়ী হিন্দুরাও এই সম্মানপ্রাপ্তির বদলে তাকে "নৃপতি তিলক" (Crown of Kings), "জগতভূষণ" (Adornment of the Universe) পদবিতে সম্মানিত করেন। আবার অন্যমতে জানা যায় যে তিনি খুব বেশি হিন্দুদের উপর উদার ছিলেন না। তিনি আসাম এবং দক্ষিণ পূর্ব যুদ্ধের সময় হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ধ্বংস করেন এবং তার সময়ে হিন্দুদের উপর ব্যাপক নিপীড়ন হয়েছিল। যদিও তিনি হয়তো সরাসরি দায়ী ছিলেন না কিন্তু প্রায়ই তিনি এই ঘটনাগুলোর দিকে দৃষ্টি দিতেন না। এটাও উল্লেখযোগ্য যে তার সময়ে প্রচুর সংখ্যক হিন্দু, ইসলামে ধর্মান্তরিত হয় সরকারি পদ এবং সামাজিক সুযোগ পাওয়ার জন্য। এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য যে বিখ্যাত বৈষ্ণব সন্ত চৈতন্য মহাপ্রভু আলাউদ্দিনের সময়েই বাংলায় বিখ্যাত হয়েছিলেন। কিন্তু কোনো একটি কারণে তিনি বাধ্য হন মাতৃভূমি বাংলা ছাড়তে এবং পার্শ্ববর্তী উড়িষ্যায় তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন,—তখন উড়িষ্যায় গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের রাজত্বকাল।

এছাড়া, সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের একজন মহান পৃষ্ঠপোষক। তিনি বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তার সময়ে বহু বিখ্যাত সাহিত্যিকের উত্থান হয়, যেমন বিজয়গুপ্ত, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি। বিদেশি মুসলিমরা বাংলা সংস্কৃতি এবং প্রথা শিখতে শুরু করলো এবং বাঙালি হিন্দুরা ফারসি ভাষা শিখতে শুরু করল প্রশাসনের উচ্চপদ পাবার জন্য।

হুসেন শাহি রাজবংশের ক্রম অনুসারে সময়কাল

সুলতান	রাজত্বকাল
আলাউদ্দিন হুসেন শাহি	১৪৯৪-১৫১৯
নাসিরুদ্দিন নুশরত শাহ	১৫১৯-১৫৩২
আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ	১৫৩২-১৫৩৩
গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহ	১৫৩৩-১৫৩৮

৪.৫ আলাউদ্দিন হুসেন শাহর উত্তরাধিকারী বর্গ ও সাম্রাজ্যের পতন

সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহির পরে তার পুত্র নাসিরুদ্দিন নুশরত শাহ (১৫১৯-১৫৩২) সুলতান হন। তিনি তাঁর পিতার শাসন ব্যবস্থার ঐতিহ্য উত্তরাধিকার সূত্রে ধরে রাখেন। তিনি দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদীর সাথে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং পশ্চিম সীমান্তে দিল্লির সুলতানের আক্রমণ বন্ধ হয়। নুশরত শাহ এর পিতার মতো রাজত্বের সম্প্রসারণের চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন এবং এই সূত্রে অহোম রাজার বিরুদ্ধে জলপথে আক্রমণ করেন কিন্তু পরাজিত হন।

কিন্তু ১৫২৬ সালে নুশরত শাহ পশ্চিম দিক থেকে এক নতুন বিপদের সম্মুখীন হন যখন জাহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবরের মুঘলদের উত্তর ভারতে আগমন ঘটে। এর ফলে তাঁর রাজত্বকালে বাংলায় প্রচুর সংখ্যক অনুপ্রবেশ ঘটে। তিনি মহম্মদ লোদীর আফগান ফৌজের সাথে মিলিত হয়ে একসাথে ঘাঘরায় যুদ্ধে ১৫২৯ সালে বাবরের সম্মুখীন হন। কিন্তু সুলতানের মিলিত ফৌজ মুঘলদের হাতে পরাজিত হয়। নুশরত শাহ, দূত মারফত অন্তবর্তী শান্তি চুক্তি করেন। ফলে মুঘলের রাজত্বসীমা বিহার অবধি সম্প্রসারিত হয়।

আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৫৩২-৩৩) ছিলেন সুলতান নাসিরুদ্দিন নুশরত শাহর ছেলে এবং তাঁর উত্তরাধিকারী। সেই সময় বাবরের মৃত্যুর পর পশ্চিমে মুঘল সাম্রাজ্যের কার্যকলাপের সাময়িক ছেদ পড়েছিল। সুতরাং ফিরোজ শাহ পূর্বে আসাম আক্রমণ করার মনোনিবেশ করেন। বাঙলার সৈন্যবাহিনী আসামে প্রবেশ করে এবং নওগাঁ অবধি পৌঁছে যায়। কিন্তু যখন যুদ্ধ পুরোদমে চলছে, সেই সময় ১৫৩৩ সালে সুলতান ফিরোজ শাহকে তার কাকা গিয়াসুদ্দিন মহম্মদ শাহ গোপনে হত্যা করেন।

আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে হত্যা করার পর তার কাকা গিয়াসুদ্দিন মহম্মদ শাহ (১৫৩৩-১৫৩৮) নিজেই মসনদে বসেন, যিনি ঘটনাচক্রে বাংলার শেষ সুলতান ছিলেন। ইতিহাসবিদরা গিয়াসুদ্দিনকে অভিযুক্ত করেন যে তার না ছিল কোন কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বা ব্যবহারিক বিচক্ষণতা, ফলে তাঁর সময়ে বাংলার রাজনৈতিক সমস্যা বৃদ্ধি পায়।

তাঁর শাসনকালে ১৫৩৪ সালে পর্তুগিজদের চট্টগ্রামে আগমন ঘটে এবং তৎক্ষণাৎ তাদের অনুপ্রবেশ করার অপরাধে বন্দি করা হয় এবং গৌড়ে বন্দি হিসেবে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীকালে পর্তুগিজদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখে পুর্নবিবেচনা করে তাদের মুক্তি দেন এবং পর্তুগিজদের অনুমতি দেন চট্টগ্রাম এবং হুগলিতে কুঠি স্থাপন করার।

শীঘ্রই গিয়াসুদ্দিন মহম্মদ শাহ দ্বিমুখী বিপদের সম্মুখীন হলেন। যথা উত্তর পশ্চিম সীমান্তে মুঘল বাদশা হুমায়নের আক্রমণ এবং তার সাথে পুস্ত আফগানদের বিদ্রোহ, যারা এই বাংলার সীমান্তে প্রচুর সংখ্যায় উপস্থিত ছিল। কিন্তু বিলাসপ্রিয় সুলতান মাহমুদ শাহ প্রমাণ করলেন যে তিনি সবচেয়ে অক্ষম এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য। বিদ্রোহী আফগানরা শীঘ্রই তাদের নতুন নেতা শের শাহ সুরির নেতৃত্বে যোগ দিল। বিদ্রোহ দমন করতে না পেরে মাহমুদ শাহ বিহারের আংশিক স্বাধীন মুঘল গর্ভনর জালাল খানের সাথে যোগ দিলেন, যিনি নিজেও নতুন শক্তি শের শাহের হাতে পর্যদুস্ত হয়েছিলেন। সুলতান মাহমুদ শাহ মুঘল সম্রাট হুমায়নকে উপুর্যপুরি চিঠি লিখলেন যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করার জন্য, কিন্তু হুমায়ন ঐ সময় গুজরাটে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার জন্য কোনই পদক্ষেপ নিতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত ১৫৩৪ সালে শের শাহ সুরির সেনাপতি ইব্রাহিম খান বাংলার মিলিত বাহিনীকে সুরজগড়ের যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং রাজধানী গৌড় এপ্রিল ১৫৩৪ সালে দখল করেন। যদিও গিয়াসুদ্দিন সেই সময় রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না কিন্তু শীঘ্রই মসনদ হারানোর দুঃখে তার মৃত্যু হয়। শের শাহ রাজধানী গৌড়ে লুঠপাট করে নাগরিকদের হত্যা করেন এবং এরই সাথে সাথে বাংলার স্বাধীন সুলতান বংশের সমাপ্তি ঘটে। শের শাহ বাংলার কোষাগার লুণ্ঠন করে তার ভবিষ্যতের মুঘলদের প্রতি আক্রমণের রসদ যোগাড় করেন।

৪.৫ পর্তুগিজদের আগমন

হুসেন শাহের সময়েই বাংলায় পর্তুগিজদের প্রথম দলটির আগমন ঘটে। কলিকটে ভাস্কা ডা গামা-র আগমনের পর থেকেই পর্তুগিজদের দ্রুত ভারতে একই সাথে বাংলায় আগমন ঘটতে থাকে। এটা জানা যায় দু একজন করে পর্তুগিজ ব্যবসায়ী বাংলার রাজধানী গৌড়ে বসবাস করা শুরু করেন। পর্তুগিজরা সেই সময়কার রাজধানী গৌড়ের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। তারা লিসবনের সাথে গৌড়ের সমৃদ্ধির তুলনা করেছেন। তাদের বর্ণনা থেকে জানা যায় সে সময় গৌড়ে দুর্গ, রাজপ্রাসাদ, দরবার, মসজিদ, বড়লোকদের বাড়ি, মানুষের আনাগোনায় গমগমে বাজার সবই ছিল, পর্তুগিজ ঐতিহাসিক Castenhada de apez বর্ণনা দিয়েছেন গৌড়ের বাড়িগুলো ছিল সব একতলা এবং অলংকৃত টাইলিস, উঠোন এবং বাগান ছিল প্রত্যেক বাড়ির সাথে। গৌড়ে ছিল আঞ্চলিক রাজনীতির কেন্দ্র। বাংলার সুলতান অনুমতি দিয়েছিলেন পর্তুগিজদের চট্টগ্রাম-এ বসতি স্থাপন করতে। Iberian Union-এর সময়কালে চট্টগ্রাম-এ সরকারি পর্তুগিজ সার্বভৌমত্ব ছিল না পর্তুগিজ ব্যবসায়ীদের বেশির ভাগই ছিল জলদস্যু যারা আরাকানদের সাথে মিলিত হয়ে বাংলায় অরাজকতা করতো।

যদিও বাংলার সুলতানী ইতিহাসে পর্তুগিজদের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভাগ ছিল। পর্তুগিজ ভ্রমণকারী বারবারোসা থেকে বাংলার সুলতানি সাম্রাজ্য সম্বন্ধে একটি পুর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায় এবং এই বিররণ থেকেই প্রাথমিকভাবে সেই সময়কার সম্বন্ধে জানা যায়। এই পর্তুগিজ ভ্রমণকারীদের লেখা থেকেই হুসেন শাহি সুলতানি-র বাড়াবাড়ি রকমের বিলাসিতা সম্বন্ধে জানা যায়। তার বর্ণনা থেকেই জানা যায় তারা ইটের তৈরি বাড়িতে বাস করতো। তাঁদের লেখা থেকেই সমসাময়িক অভিজাত সুলতানদের রন্ধন

প্রণালী, পোশাক আশাক সম্বন্ধে জানা যায় এবং এই অভিজাত শ্রেণিদের হাতেই দেশের সিংহভাগ সম্পদ মজুত থাকতো।

৪.৬ উপসংহার

সুতরাং হুসেন শাহি বংশই ছিল বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান বংশ। হুসেন শাহি সময়কালেই বিশেষ করে সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহির সময়ই বাংলায় প্রথম ইন্দো-ইসলামিক মিলিত সংস্কৃতি গড়ে উঠে। এই সময়ই বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতি উন্নতি লাভ করেছিল এবং বিদেশি মুসলিমরা "বাঙালিয়ানার" মানিয়ে নিয়ে অভ্যস্ত হলো। ইতিহাসে এই সময়কালকেই বাংলার শ্রেষ্ঠ সময় বলে চিহ্নিত করে এবং এই সময়ই বাংলার রাজত্বের সীমানা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়।

৪.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. হুসেন শাহি রাজবংশ কিভাবে তৈরি হয়েছিল? সুলতান আলাউদ্দিন মসনদে বসেই প্রথম কী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন?
২. সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহি-র শাসনকাল সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লিখুন।
৩. সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহি-র কী কী রাজনৈতিক কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন?
৪. কেন সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহিকে সাধারণভাবে "বাংলার আকবর" বলা হত?

   অথবা

   সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহি-র সামাজিক সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় কৃতিত্ব সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লিখুন।
৫. সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহি-র বংশধরদের সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লিখুন। সুলতান নুশরত শাহ ১৫২৬ সালে কী ধরনের হুমকির সম্মুখীন হয়েছিলেন?
৬. বাংলার সুলতানদের কী কী কারণে চূড়ান্ত পতনের দিকে অগ্রসর হয়?
৭. সুলতানি বাংলার ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে পর্তুগিজদের গুরুত্বপূর্ণ কেন বলা হয়?

৪.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Ali, Mohammad Mohar, *History of the Muslims in Bengal* (vol-I) (Riyadh : Imam Md. Ibn Saud Islamic University, 1985).

Chandra, Satish, *History of Medieval India* (N. Delhi : Orient Blackswan Pvt. Ltd. 2007).

Sarkar, Jadunath (ed), *A History of Bengal Muslim Period* (Vol-II) (1200-1757 AD) (N. Delhi, B. R. Publishing Corp., 2017).

একক ৫ ❑ আফগান শাসনের অধীনে বাংলা

গঠন

৫.০ উদ্দেশ্য
৫.১ ভূমিকা
৫.২ সুরী রাজবংশের অধীনে বাংলা (১৫৩৮-৫৩)
৫.৩ বাংলায় স্বাধীন সুরী রাজবংশ (১৫৫৩-৬৩)
৫.৪ বাংলায় আফগানি কাররানি রাজবংশ (১৫৬৩-৭৬)
৫.৫ বাংলায় মুঘল আক্রমণ এবং আফগানদের পরাজয়
৫.৬ উপসংহার
৫.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী
৫.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৫.০ উদ্দেশ্য

- বর্তমান অংশে মধ্যযুগে বাংলায় আফগান শাসনের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
- তিনটে স্বতন্ত্র আফগান রাজবংশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
  - ☞ সুরি রাজবংশ
  - ☞ সূর সুলতান
  - ☞ আফগান কাররানি রাজবংশ
- বাংলায় মুঘল বিজয় নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

৫.১ ভূমিকা

হুসেন শাহি রাজবংশ পতনের পর ১৫৩৮ সালে বাংলায় আফগান শাসনের সূচনা হয় এবং রাজধানী গৌড়ের পতন হয়। বাংলায় আফগান দখলকারী প্রায় ৩৮ বছর (১৫৩৮-১৫৭৬) স্থায়ী হয়েছিল। ১৫৩৮ সালে বাংলায় শের খানের (আফগান) দখলে যাওয়ার আগে আলাউদ্দিন হুসেন শাহি-র আমলে প্রচুর সংখ্যায় আফগানদের নানা সরকারি পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। শেষ হাবসি শাসক সুলতান মুজাফ্ফর শাহ-র (১৪৯০-১৪৯৩) আমলে কয়েক হাজার আফগানকে সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত করা হয়েছিল। সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহিও (১৪৯৪-১৫১৯) সশস্ত্র বাহিনীতে প্রচুর সংখ্যায় আফগান আধিকারিক ও সৈন্যকে নিয়োগ করেছিল। পরে সুলতান নুশরত শাহ-র (১৫১৯-১৫৩২)-র সময় আফগানরা গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করেছে এবং মূল পদগুলো যেমন সৈন্যবাহিনীর সর্বোচ্চ পদ অর্থাৎ সেনাপতির দায়িত্ব পেয়েছিল।

এই পটভূমিতে যখন বাবর বা হুমায়ুন এর অধীনে পূর্ব ভারতে মুঘল অনুপ্রবেশ ঘটছে সেইসময় একজন উদীয়মান যুদ্ধবাজ আফগান শের শাহ বাংলা জয় করে সিংহাসনে বসেন। সাথে সাথে বাংলার বিভিন্ন অংশে কর্মরত আফগান সৈন্য এবং আধিকারিকরা বিজয়ী এবং স্বগোত্রের শের শাহ-র অধীনে যোগ দেন এবং তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেয়।

৫.২ সুরী রাজবংশের অধীনে বাংলা (১৫৩৮-৫৩)

তেরোশো শতকের গোড়ার দিকে আফগানরা বিহারে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি শুরু করে এবং সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায় যখন দিল্লিতে লোদীরা ক্ষমতায়। ইতিমধ্যে ১৫৩০ সালে বাবরের মৃত্যুর পরে শেষ আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদীর সৎ ভাই মামুদ লোদী যিনি বাংলার নবাব নুশরত শাহ-র আশ্রয় নিয়েছিলেন, তিনি পুনরায় চেষ্টা করলেন আফগান সৈন্যদের একত্রিত করতে, কিন্তু সম্রাট বাবরের পুত্র সম্রাট হুমায়ন ১৫৩২ এ ডোরাহ্‌র যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করেন। এরপর ১৫৩৮-র এপ্রিলে শের শাহ গৌড় অধিকার করেন সুলতান গিয়াসুদ্দিন মামুদ শাহকে পরাজিত করেন। যিনি ছিলেন হুসেন শাহি রাজবংশের শেষ নবাব এবং এইভাবে তিনি বাংলায় সুরী রাজবংশের পত্তন করেন। কিন্তু সুলতান মামুদ শাহ-র অনুরোধে বাদশা হুমায়ন এগিয়ে আসেন এবং ৮ই সেপ্টেম্বর ১৫৩৮ সালে বিনা প্রতিরোধে গৌড় অধিকার করেন। উনি সেখানে পরের আট মাস অবস্থান করেন এবং তারপর দিল্লির উদ্দেশে রওনা হন। কারণ মুঘল উত্তরাধিকার নিয়ে দিল্লিতে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল। ফিরবার রাস্তায় শের খান হঠাৎ বাদশাহি ফৌজকে আক্রমণ করেন এবং যুদ্ধে মুঘল বাদশাকে পরাজিত করেন। এরপর শের খান বাংলার গর্ভনর জাহাঙ্গির কুলি খানকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং তাকে হত্যা করেন এবং অবশেষে ১৫৩৯ সালের অক্টোবরে-এ পুনরায় গৌড় অধিকার করেন। শের শাহ তার রাজত্বের সম্প্রসারণের জন্য বাংলার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি প্রথমেই মনোযোগ দিলেন প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্গঠনের উপর। বাংলার প্রথম গর্ভনর খিজির খানকে বরখাস্ত করলেন প্রতারণামূলক অপরাধের জন্য এবং চট্টগ্রাম সহ বাংলার এলাকাকে চট্টগ্রাম সহ ছোট ছোট ভাগ করলেন। এই সময় ছোট ছোট এলাকাকে এক একজন প্রশাসনিক মুখতার (Muqtars) নিযুক্ত করলেন এবং কাজি ফাজিলতকে (Kazi Fazilot) মুখতারদের মুখ্য তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিযুক্ত করলেন। শের শাহ-র এই পরিকল্পনা প্রশাসনিক স্তরে খুবই কার্যকর হয়ে ওঠে এবং অবশেষে আফগানরা বাংলায় পাকাপাকিভাবে বসতি স্থাপন করে এবং নিজেদেরকে স্থানীয় পরিবেশ এবং সংস্কৃতির সঙ্গে মানিয়ে নেয়।

শের শাহ বাংলার পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য খুব নিবিড়ভাবে সচেষ্ট হন এবং তিনি বিখ্যাত গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড বানাবার কাজ শুরু করেন সেটা বাংলার সোনারগাঁ থেকে সুদূর লাহোর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে ফলে বাংলার ব্যবসায়িক আদান প্রদানের প্রভূত বৃদ্ধি

ঘটে, বাংলার তাঁত জাতীয় উপাদান, যেমন মসলিন এখন সহজেই উত্তর ভারতের বাজারে পৌঁছায় এবং তা মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতেও পৌঁছে যায় এবং বাণিজ্যিক আদান প্রদানেরও যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটে।

An imaginary sketch work of Sher Shah Suri by Afghan artist Abdul Ghafoor Breshna

শের শাহ পুত্র এবং উত্তরাধিকারী ইসলাম শাহি (১৫৪৫-৫৩) বাংলার উপর অধিকার বজায় রাখেন। ১৫৪৫ সালে পুনরায় প্রশাসনিক উন্নয়নের জন্য কাজি ফজিলত্ কে অপসারণ করে তিনি বাংলার গর্ভনর হিসাবে মহম্মদ খান সুরকে নিযুক্ত করেন। নতুন গর্ভনর ক্ষমতায় বসেই শাসনকে সংহত করার জন্য সুলেমান নামক একজন বিদ্রোহীকে প্রাণদণ্ড দেন। এই বিষয়ে তিনি ইসলাম শাহিকে কিছু জানাননি।

৫.৩ বাংলায় স্বাধীন সূর রাজবংশ (১৫৫৩-৬৩)

১৫৫৩ সালে ইসলাম শাহির মৃত্যুর পর আদিল শাহ সূর দিল্লির সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি ছিলেন খুব দুর্বল উত্তরাধিকারী, তার সময়েই আফগানি রাজত্বের বিভিন্ন অংশে গোলযোগ শুরু হয়, পরে তার হিন্দু সেনাপতি হেমচন্দ্র বিক্রমাদিত্য বা রাজা হিমু উত্তর ভারতে সুলতানের হয়ে রাজত্ব দেখাশোনার ভার নেন। কিন্তু তিনি উত্তর ভারতের বাইরে আর নজর দিতে পারছিলেন না কারণ উত্তর পশ্চিম দিক থেকে হুমায়নের নেতৃত্বে মুঘলদের অনুপ্রবেশ ঘটছিল। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাংলার গর্ভনর মহম্মদ খান সূর নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করলেন এবং সুলতান মহম্মদ শাহ গাজি উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করলেন, এবং তিনি দিল্লির নতুন সুলতানকে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। সূর রাজবংশের চারজন সুলতানের মধ্যে মহম্মদ শাহ এবং বাহাদুর শাহ এই দুজনেই দক্ষ সুলতান ছিলেন।

মহম্মদ শাহ শুধু ত্রিপুরার রাজার থেকে চট্টগ্রাম উদ্ধার করেছিলেন তাই নয় আরাকান অংশকে বাংলার সুলতানের অধীনে এনেছিলেন। পূর্ব বিহার অবধি মহম্মদ শাহ-র অধীনে এসেছিল। পূর্ব ভারতে একচেটিয়া কর্তৃত্বর অধিকারী হয়ে মহম্মদ শাহ সম্রাট আদিল শাহ সুরির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহসী হয়েছিলেন। তিনি জৌনপুর অধিকার করে দিল্লির দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু ১৫৫৫-র ডিসেম্বর-এ চাপাঁরঘাটীর যুদ্ধে আদিল শাহ-র সেনাপতি হিমুর কাছে মহম্মদ শাহ পরাজিত এবং নিহত হন।

A portrait of HemachandraVikramaditya (alias Raja Hemu)

মহম্মদ শাহ-র মৃত্যুর পর তার জেষ্ঠ্যপুত্র খিজির খান সুলতান হন এবং তিনি গিয়াসুদ্দিন আবুল মুজাফ্ফর বাহাদুর শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করার পরে পরেই সুলতান গিয়াসুদ্দিন তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে আদিল শাহ-র বিরুদ্ধে যুদ্ধে বেরিয়ে পড়েন তার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে। সেনাপতি হিমুর বারণ করা সত্ত্বেও সুলতান আদিল শাহ নিজে সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দেন বাংলার সুলতানের বিরুদ্ধে মুঙ্গেরের সুরজগড় থেকে ৪ মাইল পশ্চিমে ফতেপুরে যুদ্ধে হয়, যুদ্ধে আদিল শাহ-র সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয় এবং সুলতান বন্দি হন, পরে সুলতান আদিল শাহকে হত্যা করা হয়। একটি বিশাল এলাকা জৌনপুর থেকে চট্টগ্রাম বাহাদুর শাহ-র অধীনে আসে।

ইতিমধ্যে মুঘলদের সেনাপতি বৈরাম খাঁ, দিল্লির আফগান সুলতানদের উৎখাত করেন এবং বয়সে নবীন জালালউদ্দিন আকবর মসনদে বসেন। বাহাদুর শাহ, আকবর নিযুক্ত পূর্ব প্রদেশের খান-ই-জমান (গর্বনর)-র সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করেন। ১৫৬০ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বাহাদুর শাহ বাংলা শাসন করেন। তার ভাই জালাল শাহ ক্ষমতায় আসেন এবং ১৫৬৩ সাল অবধি বাংলা শাসন করেন, এবং তারপর গিয়াসুদ্দিন নামে আর একজন আফগান জোর করে বাংলার ক্ষমতা অধিকার করেন এবং জালাল খানকে হত্যা করেন। পরবর্তীকালে তাজ খান কাররানি অধিকৃত সৈন্যবাহিনীকে বিপর্যস্ত করে ক্ষমতা দখল করেন এবং গিয়াসুদ্দিনকে হত্যা করেন। সেইসাথে বাংলায় কাররানি রাজবংশের পত্তন করেন।

৫.৪ বাংলায় আফগান কাররানি রাজবংশ (১৫৬৩-৭৬)

পূর্ব ভারতে কাররানি রাজবংশের উত্থানকে আফগানরা স্বাগত জানায় কারণ তারা উত্তর ভারতে মুঘলদের কাছে ক্ষমতা হারিয়েছিল। বহু আফগান উত্তর ভারত থেকে পালিয়ে বিহার এবং বাংলায় আশ্রয় নিয়েছিল। এই পালিয়ে আসা আফগানরা কাররানি শাসকদের সাথে যোগ দেওয়ায় কাররানিরা আরও শক্তিশালী হলো। তাজ খান কাররানি ছিলেন একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিক যিনি সেই ১৫৪০ সালে রাজনীতিতে এসেছিলেন। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ বদৌয়ানি তাকে আফগান শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী এবং শিক্ষিত হিসাবে আখ্যা দিয়েছিলেন। ১৫৬৩ সালেই তাজ খান কাররানির পর তার ভাই সুলেমান কাররানি ক্ষমতায় বসেন। তিনি শাসন করেন ১৫৭২-এর মৃত্যুর আগে অবধি। তিনি তার রাজধানী গৌড় থেকে থাণ্ডায় স্থানান্তর করেন, কারণ গৌড়ের আবহাওয়া এবং পরিবেশ মানুষ এবং পশু পাখিদের বাস করার জন্য অনুকূল ছিল না।

সুলেমান কাররানির সবচেয়ে গৌরবজনক এবং অন্যান্য সামরিক বিজয় হলো ওড়িশার গজপতি রাজা মুকুন্দ দেবকে ১৫৬৭ সালে যুদ্ধে পরাজিত করা। ইতিহাসবিদ সুজন ভট্টাচার্য বলেছেন, কলিঙ্গর হিন্দু রাজপতি রাজা মুকুন্দ দেবের সাথে বাদশাহ আকবরের মিত্রতা ছিল এবং বাংলার সুলতানের সাথে ছিল শত্রুতা। গজপতি এবং সুলতানের মধ্যে দুটো যুদ্ধ হয়েছিল, প্রথম যুদ্ধে গজপতি জয়ী হন, দ্বিতীয়টায় হন পরাজিত। এই যুদ্ধে আফগান সৈন্যদলের সেনাপতি ছিলেন কালাপাহাড় (উপনাম রাজিবলোচন রায়) একজন হিন্দু ধর্মান্তরিত। কালাপাহাড় বিখ্যাত ছিল হিন্দু মন্দির এবং মূর্তি ধ্বংস করার জন্য। পুরী জগন্নাথ মন্দিরের 'মাদালাপাঁজি'-তে উল্লেখ আছে কালাপাহাড় ১৫৬৮ সালে ওড়িশা আক্রমণ করে। কালাপাহাড়ের নেতৃত্বে কুখ্যাত আফগানি সৈন্যরা মন্দির ধ্বংস ও বিখ্যাত কোনারকের সূর্যমন্দির লুঠ করে। ১৫৬৮-র শেষের দিকে সুলেমান কাররানি কোচবিহার অধিকার করেন। এখানেও কালাপাহাড় আফগান সৈন্যদের নেতৃত্বে দেয় এবং গৌহাটি অবধি অগ্রসর হয় এবং বলা হয় কালাপাহাড় কামাখ্যা মন্দিরের ক্ষতিসাধন করে। কিন্তু এদের পুনঃঅগ্রসরকে অসমীয়া সৈন্যরা প্রবলভাবে বাধা দেয় এবং তারপরে আক্রমণকারী আফগান সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধে ব্যাতিব্যস্ত করে রাখে। পরে মুঘল আক্রমণের ভয়ে সুলতান সুলেইমান কাররানি কোচ রাজার সাথে সন্ধি করেন এবং তাকে তাঁর সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে অনুরোধ করেন। তিনি কোচবিহারকে মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর মিত্ররূপে পাওয়ার চেষ্টা করেন।

সুলেইমান কাররানির অন্ত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে মুঘল বাদশাহর সাথে একটি সম্পর্ক তৈরি করেন। তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ কূটনৈতিক এবং অভিজ্ঞ কৌশলী শাসক, তিনি নিয়মিত সম্রাট আকবরকে অর্থ এবং উপঢৌকন পাঠাতেন তাকে খুশি রাখার জন্য। এছাড়াও তিনি মাঝেই মাঝে তাঁর মুঘল সম্রাটের প্রতি আনুগত্য দেখাবার জন্য মসজিদে খুতবা চালু করা এবং সম্রাটের নামে মুদ্রা চালু করতেন।

সুলেইমান কাররানি ছিলেন পূর্ব ভারতে আফগানি শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক। তিনি আনুমানিক ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে মারা যান, তাকে থাণ্ডা (Tanda)-তে কবর দেওয়া হয়। তার ছেলে বায়াজিদ (Bayzid) কাররানি এরপর সিংহাসনে বসেন। সমস্ত আফগান অভিজাত রাজকীয় সভাসদস্যবর্গ এমনকি লোদী খান কাররানিও তাঁকে সিংহাসনে আসীনে সাহায্য করে। পূর্বে বাইজাগ যখন রাজ কুমার ছিল তখন থেকেই ভবিষ্যতের অবস্থান সম্বন্ধে উচ্চকাঙ্খী ছিল। কিন্তু সুলতানের সিংহাসনে বসেই তিনি দমন ও হয়রানির নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে রাজসভার সবাই একত্রিত হয়, তারা একমাসের মধ্যেই তাকে হত্যা করে এবং তার জায়গায় তার ছোট ভাই রাজকুমার দাউদ খান কাররানিকে নতুন সুলতান হন।

রাজ্যভিষেকের পরেই দাউদ খান লক্ষ্য করলেন অভিজাত আফগান শ্রেণি নিজেদের মধ্যে শত্রুতা আর ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে। তার প্রশাসনিক কাজকর্ম প্রথমেই তার ভাই এর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার মধ্য দিয়ে শুরু করেন। তিনি প্রথমেই খাজা ইলিয়াস কাররানির পুত্র খুড়তুতো ভাই হাসানকে সাজা দেন, যে সুলতান বায়াজিদকে হত্যা করেছিল। তিনি বাংলার সুলতানিয়েত একছত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হন খুতবা প্রবর্তনের মাধ্যমে এবং তিনি নিজের নামে মুদ্রা ছাপান। এই সমস্ত পদক্ষেপ সম্রাট আকবর ভীষণ অসন্তুষ্ট হন। দাউদ কাররানি বিহারের গর্ভনর হিসাবে লোদী খান কাররানিকে নিযুক্ত করেন, এবং এর দ্বারা তিনি প্রভাবশালী আফগান গুজর খানকে নিষ্ক্রিয় করেন।

বাংলার আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এই নাটকীয় পরিবর্তন মুঘলদের সাম্রাজ্যিক সম্প্রসারণের পথ খুলে দেয়। তারা এই সুযোগের সদব্যবহারের অপেক্ষায় ছিল। এর মধ্যে দাউদ খান কাররানি, সৈন্যবাহিনীর প্রধান লোদী খানকে হত্যা করলেন, এই অপরিণত ঘটনায় এই পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটালো। লোদী খানের আত্মীয় বন্ধুরা তার ছেলে ইসমাইলের নিরাপত্তার জন্য মুঘল গর্ভনর মুনিম খানের কাছে অনুরোধ করলো।

৫.৫ বাংলায় মুঘল আক্রমণ এবং আফগানদের পরাজয়

এই সময় দাউদ খান, মুঘল বাদশাহের সীমান্ত দুর্গ জামানিয়া অধিকার করেন। এতে ক্রুদ্ধ হন সম্রাট আকবর। বাংলায় আফগান সুলতানের বিরুদ্ধে আক্রমণের সুযোগ পেয়ে যান। আকবর তখন গুজরাটে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় তিনি দাউদ খানের এই দুঃসাহসের খবর পান, সাথে সাথে তিনি জৌনপুরে অবস্থিত সম্রাটের প্রতিনিধি এবং গর্ভনর মুনিম খানকে আদেশ দেন আক্রমণকারীকে শাস্তি দিতে। সেই মতো মুনিম খান সৈন্যবাহিনী নিয়ে পূর্ব দিকে অগ্রসর হন এবং আফগান সুলতানের পশ্চিমের মূল ঘাঁটি পাটনা অবরোধ করেন। কিন্তু তখন পাটনার ভারপ্রাপ্ত আফগান অভিজাত লোদী খান দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ

করেন। মুনিম খান ছিলেন বৃদ্ধ তিনি এই আফগানদের প্রতিরোধ ভাঙতে পারলেন না এবং আফগানদের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। যখন আকবর একজন চর মারফত এই খবর পেলেন তখন ভাবলেন মুনিম খান বৃদ্ধ হয়েছেন তাই হেরে গেছেন, এদিকে দাউদ আবার এই বিজয়ে লোদী খানের দক্ষতার ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়লেন। জৌনপুরের গর্ভনরের অক্ষমতায় হতাশ হয়ে আকবর তার হিন্দু অর্থমন্ত্রী রাজা টৌডোরমলকে বিহারের দায়িত্ব দিলেন। টোডরমল ছিলেন অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী। ইতিমধ্যে সুলতান দাউদ খান বিশ্বাসঘাতকের মতো লোদী খানকে হত্যা করলেন। এই অবিবেচক কাণ্ডে আফগান শক্তি আরও দুর্বল হলো।

সম্রাট আকবর ১৫৭৪ সালের ১৫ই জুন আগ্রা থেকে নদী পথে বাংলা আক্রমণ করার জন্য রওনা দিলেন। সঙ্গে ছিলেন ১৯ জন সবচেয়ে অভিজ্ঞ এবং বিশ্বস্ত সেনাপতি যেমন রাজা মান সিং, আমেরের রাজা ভগবান দাস, কাশিম খান, রাজা টোডোরমল প্রমুখ। আবুল ফজলের লেখা থেকে জানা যায় সেই সময় বর্ষাকাল। আকবর গঙ্গার নদীপথে ১৫৭৪ সালের জুলাই মাসে চৌসায় এসে পৌছান যেখানে তাঁর

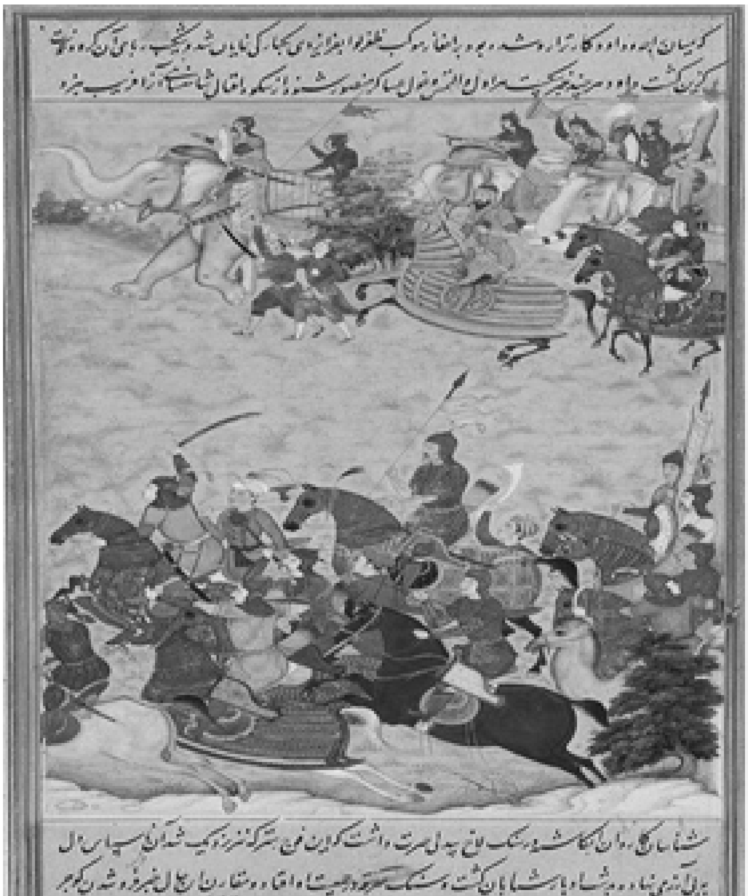

A miniature painting of Mughals leading the Bengal campaign

বাবা বাদশা হুমায়ন ১৫৩৯ সালে এই আফগানদের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৫৭৪ সালের ৩রা অগস্ট পাটনার উপকণ্ঠে পৌছান এবং পাটনা অবরোধ করেন, পাটনায় তখন সুলতান দাউদ নিজে ২০,০০০ সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। মুঘল বাহিনীর আক্রমণে একাধিক আফগান সেনাপতি মারা যান। এর ফলে আফগান বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে। পরের দিনই আফগান সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয় এবং অনেককেই হত্যা করা হয়। মুঘল বাহিনী বিশাল লুঠতরাজ চালায়, সুলতান দাউদ খান অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে কাপুরুষের মতো পালিয়ে যান।

যদিও আকবর নিজে আর এরপরে অগ্রসর না হয়ে ফতেপুর সিক্রিতে ফিরে যান, বাংলা পুনঃউদ্ধারের জন্য মুনিম খান ও রাজা টোডরমলকে দায়িত্ব দেন। মুঘল সৈন্যবাহিনী দেরি না করে বাংলার রাজধানী থাণ্ডার (গৌড়ের কাছে) দিকে অগ্রসর হয় এবং দাউদ ওড়িশায় পালিয়ে যায়। ১৫৭৫ সালের ৩রা মার্চ তুকারই-এর যুদ্ধে বা মুঘলমারির যুদ্ধে (বর্তমান বালেশ্বরে), সেখানে আফগান সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। আফগান সেনাপতি গুজর খান নিহত হন। সুলতান দাউদ খান কাররানি বাধ্য হন কটকের সন্ধি চুক্তিতে সই করতে এবং পুরো বাংলা এবং বিহারের হস্তান্তরে বাধ্য হন, শুধু ওড়িশাকে ধরে রাখতে সক্ষম হন।

ঘটনাক্রমে মুনিব খানের মৃত্যুর পর যিনি ৪০ বছর বয়সে মারা যান এই চুক্তি ভেঙে যায়। এই সুযোগে দাউদ খান বাংলা আক্রমণ করেন। কিন্তু এটি একটা সংক্ষিপ্ত জয় ছিল। মুঘল সৈন্যবাহিনী খান-ই-জামান হুসেন কুলি, রাজা টোডরমলের নেতৃত্বে ১৫ই জুলাই ১৫৭৬ সালে রাজমহলের যুদ্ধে আফগান সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি হন। বাংলার তখনকার সমস্ত আফগান সেনাপতি দাউদ খানের হয়ে যুদ্ধে যোগ দেন। কিন্তু মুঘলদের কামান ও সুযোগ্য সৈন্য পরিচালনায় দ্বারা তারা ভালোভাবেই বিজয়ী হয়। বেশিরভাগ আফগান অভিজাত যেমন জুনিয়েদ খান কাররানি, খান জাহান লোদি এবং কালাপাহাড় হয় যুদ্ধে নিহত হয় বা পরে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়। সুলতান দাউদ খান ধরা পড়েন এবং তাঁকে হত্যা করা হয়। এখন বাংলা এবং বিহারের অধিকাংশ অংশই মুঘলদের নিয়ন্ত্রণে আসে এবং অবশেষে বাংলায় আফগান শাসনের সমাপ্তি ঘটে।

যদিও পাস্তুন আফগান এবং স্থানীয় জমিদাররা যারা বারো ভুইঞা হিসাবে পরিচিত ছিল তারা ঈশা খানের নেতৃত্বে মুঘল আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে। জমিদাররা মুসলিম এবং হিন্দু উভয়ই ছিল। যেমন রাজা প্রতাপাদিত্য ১৫৯৪ সালে আকবর তাঁর সবচেয়ে দক্ষ সামরিক কমাণ্ডার ফরজানদ-ই-মুঘলিয়া রাজা মান সিং (আমেরের হিন্দু রাজা)-কে বাংলা, ওড়িশা, বিহারের গর্ভনর হিসেবে নিযুক্ত করেন বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার জন্য। মান সিং বিহারের বিদ্রোহী জমিদারদের চুর্ণ করেন এবং ওড়িশার বিদ্রোহী আফগান নেতা কুতলু খান লোহানি এবং তার ছেলে নাসির খান লোহানিকে শায়েস্তা করেন এবং তার ফলে বিহার এবং ওড়িশা সম্পূর্ণভাবে বিদ্রোহ মুক্ত হয়। তিনি কয়েকমাস বারো ভুইঞার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেন। শেষে ১৬১২ সালে জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালে পুরো বাংলাই মুঘল সাম্রাজ্যের অংশ হয়।

৫.৬ উপসংহার

এইভাবে আফগানরা প্রায় চল্লিশ বছর বাংলা শাসন করেছিল। এই শাসন ব্যবস্থার সময় বাংলা সাক্ষী থাকলো ইতিহাসের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণের সাথে যখন বাংলা সম্পূর্ণভাবে মূল ভারতের শাসন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হলো অর্থাৎ মুঘল বাদশাহের অধীনস্থ হল, সুরী, কাররানি রাজবংশ এবং শেষে বারো ভুইঞারা আফগান শাসন ব্যবস্থায় একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার রূপে ছিল।

৫.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. বাংলায় আফগান শাসন কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

২. বাংলায় শের শাহের শাসন ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৩. বাংলায় স্বাধীন সুরি সাম্রাজ্য কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? কীভাবে তাদের সাথে দিল্লীর সুর সাম্রাজ্যের মনোমালিন্য হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৪. সুলতান সুলেইমান কাররানির সময় সাম্রাজ্যের বিস্তার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৫. সুলতান দাউদ খান কাররানি কী পদ্ধতিতে শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতির মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতেন?

৬. আকবরের সময় বাংলায় মুঘল অভিযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। কীভাবে বাংলায় আফগান সাম্রাজ্যের সমাপ্তি ঘটে ছিল?

৭. বারো ভুইঞা কাদের বলা হত? মুঘল বাদশাহের পূর্ব সীমান্তে রাজা মান সিং-এর কী ভূমিকা ছিল?

৫.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

Ali, Mohammad Mohar, *History of the Muslims in Bengal* (vol-I) (Riyadh : Imam Md. Ibn Saud Islamic University, 1985).

Chandra, Satish, *History of Medieval India* (N. Delhi : Orient Blackswan Pvt. Ltd. 2007).

Sarkar, Jadunath (ed), *A History of Bengal Muslim Period* (Vol-II) (1200-1757 AD) (N. Delhi, B. R. Publishing Corporation, 2017).

পর্যায়-২

মধ্যযুগের বাংলা : রাজনৈতিক বিকাশ (১৫৭৫-১৭০৭)

একক ৬ ❑ বিহার ও বাংলায় মুঘল বিজয়

গঠন

৬.০ উদ্দেশ্য

৬.১ ভূমিকা

৬.২ বাংলায় প্রথম মুঘল আক্রমণে আফগানি কাররানি রাজত্বের পতন।

৬.৩ বাংলায় মুঘল শাসনের প্রারম্ভিক বছর (১৫৭৬-৮০)

৬.৪ বাংলার গর্ভনর হিসাবে মির্জা রাজা মান সিং-এর আগমন।

৬.৫ উপসংহার

৬.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

৬.৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৬.০ উদ্দেশ্য

- আলোচ্য অংশে বাংলায় মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠা ও গঠন সম্বন্ধে বলা হয়েছে।
- আলোচ্য অংশে প্রাথমিক মুঘল শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।
- আলোচ্য অংশে বাংলার ইতিহাসে মুঘল শাসক মান সিং-এর ভূমিকা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা হয়েছে।

৬.১ ভূমিকা

বাংলা ছিল খুব সম্পদশালী একটি রাজ্য, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপ অববাহিকায় অবস্থিত। অতি উর্বর বাংলা প্রচুর ফসল উৎপাদন করতো এবং যা প্রচুর রাজস্ব আনতো সেই আদি-মধ্যযুগের শশাঙ্ক এবং পাল রাজাদের সময় থেকে। যখনই কোন উচ্চকাঙ্খী সম্রাট উত্তর ভারতে ক্ষমতায় বসতেন তিনি সবসময় বাংলাকে তার রাজত্বের অন্তর্গত করতে চাইতেন, সে পাল বংশই হোক বা মুসলিম তুর্কিরা, আফগানরা আর একদম শেষে মুঘলরা যেই হোক। বাংলায় প্রথম মুঘল আক্রমণ হয়েছিল বাদশা হুমায়নের রাজত্বকালে, যা তাকে শের শাহ সুরির সাথে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করেছিল। কিছুদিনের জন্য মুঘলদের পরাজয়ে বাংলায় আফগানি কাররানি শাসন ব্যবস্থা (১৫৬৩-৭৬) প্রতিষ্ঠা পায়; মুঘল আফগান ক্ষণস্থায়ী যুদ্ধ বিরতি ঘটে।

আবার আকবরের রাজত্বকালে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয় ১৫৭৫ সালে এই সময় আকবর ব্যস্ত ছিলেন উত্তর ভারতে তাঁর রাজত্ব শক্তিশালী করতে এবং একই সঙ্গে রাজপুতনায় মহারাণা প্রতাপের সাথে যুদ্ধ করতে। হলদিঘাটি যুদ্ধের পর (১৫৭৬) আকবর পূর্ব দিকে নজর দিলেন বাংলার হারানো রাজত্ব পুন-উদ্ধারের জন্য। এইসময় বাংলার তদানীন্তন আফগান সুলতান দাউদ খান কাররানির কতকগুলি দায়িত্বহীন কাজকর্মের এবং আচরণে, আকবর বাংলা আক্রমণ করার সুবর্ণ সুযোগ পেলেন।

৬.২ বাংলায় মুঘল আক্রমণে আফগানি কাররানি রাজত্বের পতন

১৫৭৪ সালে দাউদ খান জামানিয়া দুর্গা অধিকার করেন। যেটা ছিল তখনকার মুঘল সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী শেষ দুর্গ। এর ফলে আকবর একরকম বাধ্য হলেন বাংলার আফগান সুলতানের বিরুদ্ধে অভিযান করতে। আকবর সেই সময় ছিলেন গুজরাতে, যে মূহুর্তে তিনি দাউদ খানের এই দুঃসাহস-এর

A miniature painting of Mughals leading the Bengal campaign

খবর পেলেন তৎক্ষণাৎ জৌনপুরের মুঘল শাসক মুনিম খানকে নির্দেশ পাঠালেন বাহিনী নিয়ে বাংলার দিকে অগ্রসর হতে। মুনিম খান সাথে সাথে পূর্ব দিকে অগ্রসর হলেন এবং পাটনা অবরোধ করলেন, যেটা আফগান রাজত্বের পশ্চিমদিকের শেষ ঘাঁটি। কিন্তু এখানে তাকে খুব ভালরকমভাবে প্রতিরোধ করলেন লোধি খান, যিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী আফগান উচ্চবংশীয় এবং যিনি সেই সময় পাটনা দুর্গের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক। বৃদ্ধ মুনিম খান আফগান প্রতিরোধ ভাঙতে পারলেন না এবং বাধ্য হলেন প্রতিপক্ষের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে। এই ঘটনায় দুই পক্ষের মুখ্য আধিকারিকরা খুশি হলেন না। সম্রাট আকবর ভাবলেন বৃদ্ধ মুনিম খান খুব সহজেই যুদ্ধবিরতি মেনে নিলেন, ওদিকে দাউদ খান তার মন্ত্রি লোধি খানের ক্ষমতা দেখে ইর্ষান্বিত হলেন। জৌনপুরের গভর্নরের অক্ষমতায় হতাশ হয়ে আকবর শেষে তার হিন্দু অর্থ মন্ত্রী রাজা টোডরমলকে যিনি ছিলেন সেই সময়কার অত্যন্ত দক্ষ অনুগত একজন রাজ কর্মচারী তাকে বিহারের দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন এরই মধ্যে সুলতান দাউদ খান বিশ্বাসঘাতকতা করে লোধি খানকে হত্যা করলেন। এই দায়িত্বহীন ঘটনার কারণে আফগান ক্ষমতা আরও হ্রাস পেল।

১৫ই জুন ১৫৭৪ সালে আকবর তার নৌবাহিনী নিয়ে আগ্রা থেকে বাংলা বিজয়ের সূচনা করেন। তার সঙ্গে ছিল ১৯ জন অত্যন্ত দক্ষ সেনাপতি, যেমন রাজা মান সিং, আমেরের রাজা ভগবান দাস, কাসেম খান এবং রাজা টোডরমল ইত্যাদি। আকবরের সভাসদ আবুল ফজলের বয়ান অনুযায়ী সেই সময় ছিল বর্ষাকাল। গঙ্গার গতিপথ ধরে নৌবাহিনী এগিয়ে এসে ১৫৭৪-এর জুলাই মাসে আকবর চৌসা এসে পৌছান, যেখান তার বাবা সম্রাট হুমায়নকে ১৫৩৯ সালে ভয়ানক পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল এই আফগানদের হাতেই। ১৫৭৪ সালের ৩রা আগস্ট অবশেষে তিনি পাটনার নিকটবর্তী স্থানে অবতরণ করেন এবং পাটনা শহর অবরোধ করেন। যেখানে সুলতান দাউদ নিজে তাঁর ২০,০০০ সৈন্য নিয়ে অবস্থান করেছিলেন। এর ফলে মুঘল-আফগান যুদ্ধ শুরু হয়। আফগান নেতাদের অনেককে হত্যা করে তাদের মৃতদেহ আকবরের কাছে নৌকায় পাঠালে তিনি সেগুলো আবার দাউদের কাছে তার ভাগ্যের ইঙ্গিত হিসেবে যেটা যথসময়ে তার ক্ষেত্রেও ঘটতে চলেছে হিসাবে পাঠিয়ে দেন। ঠিক তার পরের দিনই শহরের পতন ঘটে এবং বহু আফগান সৈন্যকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। পাটনা শহর মুঘল সৈন্যদের হাতে লুণ্ঠিত হয় এবং সুলতান দাউদ খান কাপুরুষের মতো রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যান।

যদিও আকবর নিজে এরপরে আর অগ্রসর না হয়ে ফতেপুর সিক্রিতে ফিরে আসেন। ফিরে আসার আগে বাংলা বিজয়ের জন্য মুনিম খান এবং রাজা টোডরমলের যৌথ নেতৃত্বে উপর ভার দেন। সময় নষ্ট না করে মুঘল সৈন্যবাহিনী বাংলার রাজধানী টান্ডা (Tanda) (গৌড়র কাছে)য় পৌছায়, দাউদ খান ওড়িষ্যা আশ্রয় নেয়। পরবর্তী টাকোরির যুদ্ধ। যেটা ভাজোয়ারার যুদ্ধ বা মুঘলমারি যুদ্ধ হিসাবেও পরিচিত, এখনকার বালেশ্বর জেলার মধ্যে, সেখানে ৩রা মার্চ ১৫৭৫ সালে আফগান সৈন্যবাহিনী সম্পুর্ণভাবে পরাজিত হয়। আফগান সেনাপতি গুর্জর খান নিহত হন। সুলতান দাউদ খান বাধ্য হন কটকের চুক্তি করতে যেখানে বাংলা এবং বিহারের হস্তান্তর মেনে নিতে বাধ্য হন, শুধুমাত্র ওড়িশা দাউদের অধিকারে থাকে।

৪০ বছর বয়েসে মুনিম খানের মৃত্যুর সাথে সাথেই এই চুক্তি ভেঙে যায়। সুলতান দাউদ খান মুনিম খানের মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে বাংলা জয় করেন, কিন্তু এই বিজয় ছিল ক্ষণস্থায়ী। খানে-এ-জাহান হুসেন

কুলি বাগ ও রাজা টোডরমলের নেতৃত্বে মুঘল সৈন্যবাহিনী এখনকার ঝাড়খণ্ডের রাজমহলে ১৫ই জুলাই ১৫৭৬ সালে আফগানদের সঙ্গে শেষ যুদ্ধে সম্মুখীন হয়। বাংলার সমস্ত আফগান সেনাপতিরা সুলতান দাউদ খান কাররানির সাথে একসাথে যুদ্ধে যোগ দেন। কিন্তু মুঘলদের আগ্নেয়াস্ত্র ও উন্নতমানের যুদ্ধ পরিচালনায় আফগানরা পরাজিত হয়। প্রায় সমস্ত আফগান সর্দার যেমন জুনিয়েদ খান কাররানি, খান জাহান লোদী এবং কালাপাহাড় (উপনাম রাজীবলোচন রায়) হয় নিহত বা পরে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়। সুলতান দাউদ খান কাররানি ধরা পড়েন এবং নিহত হন। বাংলা এবং বিহারের বেশিরভাগ অঞ্চলেই শেষ পর্যন্ত মুঘলদের অধিকারে আসে এবং বাংলায় আফগান রাজত্বের সমাপ্তি ঘটে।

৬.৩ বাংলায় মুঘল শাসনে প্রারম্ভিক বছর (১৫৭৬-৮০)

১৫৭৬ সালে রাজমহলের যুদ্ধে কাররানি রাজবংশের শেষ আফগান সম্রাটের পরাজয় এবং নিহত হওয়ার পরে বাংলা আনুষ্ঠানিকভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের সুবা বা রাজ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হলো। বাংলায় মুঘলদের এই শাসন ব্যবস্থা টিকে ছিল আঠোরশো শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত, মুর্শিদকুলি খাঁর সময়কাল পর্যন্ত। তিনি বাংলায় মুঘলদের প্রতিনিধি ছিলেন, কিন্তু সেইসময় মুঘল শাসনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজেকে স্বাধীন হিসাবেই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। প্রথম কিছু বছর মুঘল শাসকরা সুরক্ষিত শহর ঢাকা বা টান্ডা থেকেই রাজ্য পরিচালনা করতেন যখন গ্রাম বাংলা ছিল হিন্দু শক্তিশালী জমিদারদের অধীনে বা পাঠান অধিপতিদের অধীনে। এই ব্যবস্থায় মাঝে মাঝেই মুঘলদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের অবনতি হত।

প্রথম দুজন সুবেদার যথাক্রমে খান-ই-জাহান (১৫৭৫-৭৮) এবং মুজাফ্ফর খান (১৫৭৮-৮০) সম্বন্ধে কমই জানা যায়। বাংলা বিহার অঞ্চলে আকবরের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ শুরু করে রক্ষণশীল মুসলিমরা, আকবরের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এবং আকবরের জমির পাট্টা সম্বন্ধে কিছু কেন্দ্রীয় আইন পরিবর্তনের ফলে তাদের নিজস্ব স্বার্থহানি হওয়ার জন্য, সৈন্যদের মাইনে কমে যাওয়ার মতো একাধিক কারণে। এই বিদ্রোহীরা কাবুলে আকবরের ভাই মির্জা হাকিমের সাথে যোগাযোগ করে যে দিল্লীর সিংহাসনের দাবিদার ছিল। এই ঘটনাকে আবুল-ই-ফজল “বাংলার রাজকর্মচারীদের বিদ্রোহ” হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক R. D. Banerjee “আরেকটি আফগান যুদ্ধ” বলে উল্লেখ করেছেন। আফগান বিদ্রোহ শুরু হয় ১৫৮০ সালের ২৮-এ জানুয়ারি। বাংলার বিদ্রোহীরা রাজমহলের কাছে গঙ্গা অতিক্রম করে বিহারের বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেয়। আকবরের গর্ভনর মুজাফ্ফর খান পরাজিত হন এবং মির্জা হাকিমের নামে খুতবা পাঠ হয়। ১৫৮২ সালে আকবর আবার খান আজমকে সুবেদার এবং রাজা টোডরমলকে তার সহকারি হিসাবে হারানো প্রদেশ পুনঃউদ্ধার করতে পাঠান। খান আজম তেলিয়াগড়ির যুদ্ধে মাসুম খান কাবুলির নেতৃত্বাধীন আফগানি ফৌজকে পরাজিত করেন। কিন্তু এই অভিযানের সার্বিকভাবে সফল হয় না কারণ মাসুম কাবুলি বাংলার বারো ভুইঞার অন্যতম ইশা খানের সাথে যোগ দিয়ে বিদ্রোহ জারি রাখেন। আকবর এরপর আরেকজন নতুন সুবেদার শাহাবাজ খানকে পাঠান। কিন্তু তিনিও সফল হন না, শাহবাজ টান্ডাতে তার রাজধানী স্থাপন করেন। কিন্তু বিদ্রোহী আফগানরা মালদা অবধি তাদের

কার্যকলাপ চালাতে সক্ষম ছিল। পূর্বতন সুবেদার খান আজম আর বর্তমান সুবেদার শাহবাজ খানের নিজেদের ঈর্ষার জন্য মুঘলদের সুবে বাংলার পুনঃউদ্ধার বিলম্ব হচ্ছিল। ইতিমধ্যে বাংলার পূর্বতন আফগান সুলতান দাউদের সেনাপতি কুতলু খান লেহানি, যার সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে একটি চরিত্র তৈরি করেছিলেন, ওড়িশা অধিকার করে প্রায় বর্ধমান পর্যন্ত এগিয়ে আসেন। কিন্তু ১৫৮৪ সালে বর্ধমানের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মুঘলদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

কুতলু খান আত্মসমর্পণ করার পর শাহবাজ খান তাকে ওড়িশায় নির্বাসিত করেন। মুঘলরা নতুন প্রশাসনিক শাসন ব্যবস্থা বাংলায় প্রচলন করেন। সুবেদার বা সিপাহি-সালারের অধীনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাকে বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগ করা হয় যেমন দেওয়ান (রেভিনিউ), সাদার (Justice), কাজি (Criminal Justice), বক্সি (সামরিক Accounts) এবং কোতয়াল (শহরের ইনচার্জ)। শাহবাজ খান মাসুম কাবুলির পাঠান সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেন এবং তাদের ঢাকা বিক্রমপুর অবধি তাড়িয়ে নিয়ে যান, যেটা ইশা খানের অধীনে ছিল। এইবার ইশা খানকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়। ইশা খান কয়েক মাস ধরে নানা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভ্রান্ত করতে থাকেন এবং ১৫৮৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর হঠাৎ করে আক্রমণ করেন। শাহবাজ খান পরাজিত হন এবং বাধ্য হন রাজধানী টান্ডাতে ফিরে যেতে। শাহবাজ খান কূটনীতি এবং অর্থশক্তির সাহায্যে ১৫৮৬-৮৭-র মধ্যে কয়েকজন পাঠান জমিদারদের বশ্যতা স্বীকার করান। এইবার ইশা খান বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং মুঘলদের সাথে শান্তিচুক্তি করেন। মাসুম খান কাবুলি তার ছেলেকে দিল্লির দরবারে পাঠান এবং নিজে মক্কায় চলে যান। ১৫৮৭ সালের মধ্যেই গোটা বাংলায় আকবরের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

সেই সময় থেকে ১৭১৭ সালে সুবেদার মুর্শিদকুলি খানের সময় অবধি বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের একটি সুবা বা রাজ্য ছিল এবং সুবেদাররা দিল্লির নির্দেশ অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা চালাতো।

৬.৪ বাংলার শাসক হিসাবে মির্জা রাজা মান সিং-এর আগমন

শাহবাজ খানের পরে আকবর আজমিরের রাজা মান সিং কাছওয়াতকে বাংলার শাসক হিসাবে নিযুক্ত করলেন।

রাজা মান সিং ছিলেন মুঘলদের একজন অতিদক্ষ রাজপুত সেনাপতি, এবং আকবরের সভার নবরত্নদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন আকবরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একজন সেনাপতি। মান সিংহ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মুঘল সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দেন রাজপুতনা, কাশ্মীর ও উত্তর পশ্চিম ভারতের যুদ্ধে। হিন্দু রাজপুত হওয়া সত্বেও মান সিং মুঘলদের অত্যন্ত সম্মানিয় খেতাব ফারজান্দ (a sort of adapted son of Emperor) ও "সিপাহি-সালার মুঘলিয়া" খেতাবে ভূষিত হন। তাঁর প্রশংসনীয় সামরিক ও কৌশলগত দক্ষতার জন্য মান সিংকে বলা হত আকবরের শেষ অস্ত্র, যুদ্ধে যেখানে মুঘলবাহিনী প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখে পড়তো। বাংলায় মান সিং-এর শাসনকালে উল্লেখযোগ্য দিক হলো সেই অস্থির সময়ের যুদ্ধবাজ ভূস্বামীদের তিনি অধীনে আনতে পেরেছিলেন যারা সেই সময় বাংলার নানা অংশে নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা

গড়ে তুলেছিলেন। মান সিং-কে ১৫৯৩ সালে বাংলার শাসক হিসাবে নিয়োগ করা হয় এবং ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে অবধি তিনি বাংলাকে মুঘলদের পুরো নিয়ন্ত্রণে রাখেন শুধুমাত্র কিছুদিনের জন্য দুটো বিচ্ছিন্ন

Raja Man Singh Khacchawat

কারণে তার দুই ছেলেকে সামরিকভাবে শাসক হিসাবে নিয়োগ করেন। শেষ পর্যন্ত ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে বাদশাহ জাহাঙ্গিরের সিংহাসনে অভিষেকের সময় তাকে দিল্লিতে ফিরিয়ে আনা হয়।

বাংলার রাজধানী টান্ডায় পৌঁছেই, মান সিং বাংলার বিভিন্ন দিকে মুঘল সৈন্য পাঠান বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে। মান সিং-এর ছেলে হিম্মত সিং ১৫৯৫ সালের এপ্রিলে ভুষণা দুর্গ অধিকার করে। ৭ই নভেম্বর ১৫৯৫ সালে মান সিং রাজমহলে নতুন রাজধানীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং নাম দেন আকবরনগর। তিনি প্রথম ইশা খানের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন এবং তাঁকে বাধ্য করেন ব্রহ্মপুত্র নদীর পূর্ব দিক অবধি সরে যেতে। ইশা খানের অধিকাংশ জমিদাররা মুঘলদের হাতে পরাজিত হয় এবং বাংলার অন্য অংশগুলোতেও বিদ্রোহীদেরও দমন করা হয়। ১৫৯৬ সালে মান সিং তার ঘোড়াঘাটের তাঁবুতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন, এই খবর পাওয়ার পর অন্যান্য বিদ্রোহীরা একসাথে নৌবাহিনী নিয়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে নদীপথে অগ্রসর হয় এবং যেহেতু মুঘলদের নৌবাহিনী ছিল না, বিদ্রোহীরা বিনা প্রতিরোধে ঘোড়াঘাটের ২৪ কিলোমিটারের মধ্যে এগিয়ে আসে। কিন্তু তারা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়

নদীর জলস্তর নেমে যাওয়ার জন্য। মান সিং সুস্থ হওয়ার পর বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সৈন্যদল পাঠান, এবং বিদ্রোহীরা পালিয়ে ময়মনসিং-এ গিরিসুন্দর জঙ্গলে আশ্রয় নেয়।

ইশা খান, বারো ভুইঞাদের অন্যতম শ্রীপুরের জমিদার কেদার রায়ের সাথে যোগ দেন। কোচবিহারের রাজা লক্ষীনারায়ণ মুঘলদের সাথে যোগ দেন, কিন্তু তার ভাইপো রঘুদেব ইশা খানের দলে যোগ দেন এবং তারা কোচবিহার অধিকার করেন। লক্ষীনারায়ণ মান সিং-এর কাছে সাহায্যের আবেদন করেন। ১৫৯৬-র শেষভাগে মান সিং, ইশা খানের বিরুদ্ধে সেন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন, এবং ইশা খান পালিয়ে যান, কিন্তু মুঘল সৈন্যবাহিনী বিদায় নেওয়ার সাথে সাথে পুনরায় কোচবিহার অধিকার করেন।

এরই প্রতিক্রিয়ায় মান সিং তার এক ছেলে দুর্জন সিং-কে পদাতিক বাহিনী এবং নৌবাহিনী দিয়ে পাঠান এবং তারা ইশা খানের কাতরাভু সুরক্ষিত প্রাসাদ অধিকার করেন। ১৫৯৭ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর ইশা খান ও মাসুম খানের বিশাল নৌবাহিনী মুঘল সৈন্যবাহিনীকে ঘিরে ফেলে এবং দুর্জন সিং পরাজিত হন এবং বহু মুঘল সৈন্য বন্দি হয়। কিন্তু রাজা মান সিং-এর সম্ভাব্য প্রতিশোধের ভয়ে ইশা খান বন্দিদের মুক্ত করে দেন।, কোচবিহার থেকে সৈন্য প্রত্যাহর করেন এবং মুঘলদের সাথে সন্ধি করেন এবং বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করে নেন, এর দুবছর বাদে ১৫৯৯ সালে ইশা খান মারা যান।

ইতিমধ্যে মান সিং-এর আর এক ছেলে হিম্মত সিং ভুষণা জয় করেন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কলেরায় তিনি মারা যান। দুই পুত্রের মৃত্যুর পর মান সিং বাদশাহের অনুমতি নিয়ে ১৫৯৮ সালে আজমির যান বিশ্রাম নিতে এবং তার জায়গায় তার বড় ছেলে জগত সিংকে বাংলার শাসক করা হয়। কিন্তু জগত সিং প্রচুর মদ্যপানের জন্য আগ্রাতে মারা যান। এরপর মান সিং-এর ছোট ছেলে মহাসিং-কে বাংলার শাসক হিসাবে নিয়োগ করা হয়, কিন্তু মান সিং এর সামগ্রিক দায়িত্ব থাকে। এই সুযোগ বাংলার পাঠানরা আবার মাথা তোলার সুযোগ পেল এবং নানা সময়ে বিভিন্ন স্থানে মুঘলবাহিনীর সাথে দক্ষতার সঙ্গে যুদ্ধ করে ওড়িশার কিছু অংশসহ বহু জায়গা পুনঃদখল করলো।

এই বিপরীত ঘটনাপ্রবাহে মান সিং বাধ্য হলো বাংলায় ফিরে আসতে। ১৬০১ সালে পূর্ব বাংলার বিদ্রোহীদের দমন করা হলো। পরের বছর মান সিং ঢাকার কাছে তাঁর তাঁবু স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে শ্রীপুরের জমিদার কেদার রায় ওড়িশার পাঠান শাসক মৃত কুতলু খানের ভাইপো উসমানের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। উসমান তার নিয়ন্ত্রণ পূর্বদিকে সরিয়ে নিয়ে আসার জন্য ব্রহ্মপুত্র নদী পেরিয়ে সেই অঞ্চলের মুঘল কমান্ডারকে যুদ্ধে পরাজিত করে বাধ্য করলেন তাকে ভাওয়াল এ আশ্রয় দিতে। এই খবর পাওয়া মাত্র মান সিং ভাওয়ালের দিকে অগ্রসর হলেন এবং উসমানকে পরাজিত করলেন। বহু পাঠান মারা যায়, প্রচুর পাঠান যুদ্ধ জাহাজ মুঘলরা অধিকার করে এবং প্রচুর গোলাবারুদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। ইতিমধ্যে কেদার রায় বিদ্রোহ করে ইশা খানের পুত্র মুসা খানের সাথে যোগ দিলেন, এছাড়া কুতলু খানের মন্ত্রিপুত্র দাউদ খান এবং আরও কিছু জমিদার একত্র হলেন।

মান সিং ১৬০২ সালে ঢাকা পৌঁছে বিদ্রোহী দমন করার জন্য সৈন্যদল পাঠালেন, কিন্তু তারা কোনমতেই অশান্ত ইছামতি নদী বহু চেষ্টা করেও পার হতে পারলে না। মান সিং নিজে শাহাপুর পৌঁছে হাতির পিঠে নদী পার হলেন এবং পিছন পিছন অশ্বরোহী বাহিনী তাকে অনুসরণ করে পার হলো। এর

পরে মান সিং বিদ্রোহীদের আক্রমণ করে তাদের পরাজিত করলেন এবং তাদের বহু দূর অবধি তাড়া করে গেলেন।

এই সময় নতুন এক উপদ্রব শুরু হয়েছিল আরাকানের মগ জলদস্যুরা ঢাকার কাছে নদীপথে এসে গ্রাম লুঠ করে নদীপথেই পালিয়ে যেত। মান সিং তাদের আক্রমণ করে বাধ্য করলো তাদের নৌকায় আশ্রয় নিতে। কেদার রায় তার নৌবাহিনী নিয়ে মগেদের সাথে যোগ দিয়ে শ্রীনগরে মুঘল ফাঁড়ি আক্রমণ করেন, মান সিং কামানসহ সৈন্যবাহিনী পাঠান এবং ফাঁড়ি মুক্ত করেন। বিক্রমপুরের কাছে এক ভীষণ যুদ্ধে কেদার রায় আহত হন এবং ধরা পড়েন কিন্তু মান সিং-এর কাছে নিয়ে আসার আগেই তার মৃত্যু হয় (১৬০৩)। কেদার রায়ের সৈন্যবাহিনী, পর্তুগিজ জলদস্যু এবং বাঙালি নাবিক নিহত হয় এবং আরাকান রাজা বাধ্য হন নিজের দেশে ফিরে যেতে। মান সিং এবার উসমানের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেন, কিন্তু উসমান মুঘল নিয়ন্ত্রণের বাইরে পূর্ব অনেক দূরে পালিয়ে যায়। এরপরে বাংলায় শান্তি ফিরে আসে।

১৬০৫ সালে আকবরের মৃত্যুর পর তার ছেলে সেলিম রাজ সিংহাসনে বসেন এবং জাহাঙ্গির নাম দেন। সেই সময় বর্ধমানের ফৌজদার ছিলেন শের আফগান। তার স্ত্রী মেহেরুউন্নিসা ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী।

একটি জনপ্রিয় বিশ্বাস অনুযায়ী যার কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ বা সত্যতা পাওয়া যায়নি তা হলো মেহেরুউন্নিসার বিবাহের আগেই জাহাঙ্গির তার অপরূপ রূপের প্রেমে পড়েছিলেন এবং বাদশাহ হওয়ার পর তাঁকে অধিকার করতে চেয়েছিলেন। মেহেরুউন্নিসাকে সহজেই অধিকার করার জন্য জাহাঙ্গির প্রথমে মান সিং-কে বাংলার থেকে আগ্রায় ফিরিয়ে আনেন এবং তার অত্যন্ত বিশ্বস্ত কুতব-উদ-দিন খান কোকাকে বাংলার সুবেদার করে পাঠান, যিনি ছিলেন তার পালক মায়ের পুত্র। শের আফগানকে তার আনুগত্যের অভাবে অভিযুক্ত করা হয় এবং এই ব্যাপারে আলোচনা আহ্বান করা হয় নিষ্পত্তির জন্য। কুতব-উদ-দিন আলোচনা করার জন্য বর্ধমানে শের আফগানের সাথে দেখা করেন, সেখানে আলোচনার সময় ঝগড়া এবং হাতাহাতি আরম্ভ হয় এবং শের আফগান কুতব-উদ-দিনকে হত্যা করেন, কিন্তু শের আফগানও কুতব-উদ-দিন সঙ্গীদের হাতে নিহত হন। শের আফগানের বিধবাকে আগ্রায় মুঘল বাদশাহি হারেমে নিয়ে আসা হয় এবং এর চার বছর বাদে ১৬১১ সালে জাহাঙ্গিরের সাথে বিবাহ হয়। তার নতুন নামকরণ হয় নূরজাহান। তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র এবং আস্তে আস্তে সিংহাসনের পেছনে আসল শক্তি হয়ে ওঠেন এবং ইতিহাসে সম্রাজ্ঞী নূরজাহান বেগম হিসাবে পরিচিতি পান।

৬.৫ উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে এটাই বলা যায় যে ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে আকবরের মৃত্যুর সময় ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম ভাগ থেকে বাংলার বেশির ভাগ অংশই মুঘল শাসনের অধীনে আসে। বাংলাকে মুঘল সাম্রাজ্যের সাথে একত্রিকরণের প্রধান কারিগর ছিলেন সুবেদার বা শাসক মান সিং।

৬.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. কোন বিষয়গুলির জন্য ১৫৭৪ সালে বাদশাহ আকবর বাধ্য হয়েছিলেন বাংলা অভিযান করতে? একদম প্রাথমিক অভিযানে তিনি মুঘল ক্ষমতাকে কীভাবে সংহত করেছিলেন?

২. কী কী পরিস্থিতির কারণে রাজমহলে যুদ্ধ হয়েছিল? যুদ্ধের ফলাফল কী হয়েছিল?

৩. বাংলায় কী কী কারণে আফগানি কাররানি বংশ অবশেষে শেষ হলো?

৪. বাংলায় মুঘল নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য রাজা মান সিং কী কী সামরিক ও কৌশলগত অবস্থান নিয়েছিলেন তার বর্ণনা করুন।

৬.৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Chandra, Satish, *History of Medieval India* (N. Delhi : Orient Blackswan Pvt. Ltd. 2007).

Sarkar, Jadunath (ed), *A History of Bengal Muslim Period* (Vol-II) (1200-1757 AD) (N. Delhi, B. R. Publishing Corporation, 2017).

Sengupta, Nitish, *Land of two rives, A history of Bengal from Mahabharata to Mujib*, (N. Delhi : Penguin Books, 2017.

একক ৭ ❑ জাহাঙ্গির ও শাহজাহানের আমলে বাংলা

গঠন

৭.০ উদ্দেশ্য
৭.১ ভূমিকা
৭.২ কুতব-উদ-দিন কোকার হত্যা
৭.৩ সুবেদার ইসলাম খানের শাসন এবং মুসা খানের বিদ্রোহ
৭.৪ রাজা প্রতাপাদিত্যের সাথে যুদ্ধ
৭.৫ ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তকরণ
৭.৬ কামরূপ অভিযান
৭.৭ কাশিম খান এবং ইব্রাহিম খানের শাসন ব্যবস্থা
৭.৮ উপসংহার
৭.৯ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী
৭.১০ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৭.০ উদ্দেশ্য

- আলোচ্য অংশে বাংলায় জাহাঙ্গির ও শাহজাহানের সময়কার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
- এই অংশে শিক্ষার্থীরা বাংলায় মুঘল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ সম্বন্ধে জানতে পারবে।
- বাংলায় রাজধানী হিসাবে ঢাকার উত্থান সম্বন্ধেও এই অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

৭.১ ভূমিকা

১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে আকবরের মৃত্যুর আগেই প্রায় সমগ্র বাংলা মুঘল আধিপত্য সম্পূর্ণ হয়েছিল। বাংলার উর্বর জমির ফসল উৎপাদনের ফলে মোটা অংকের রাজস্ব মুঘল কোষাগারে জমা হওয়া শুরু হয়েছিল। সুতরাং গোটা সপ্তদশ শতক ধরে বাংলায় মুঘল আধিপত্য বজায় রাখা মুঘলদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। ১৬০৫ সালে আকবরের মৃত্যুর পর তার পুত্র সেলিম, জাহাঙ্গির উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। সেই সময় বর্ধমানের ফৌজদার ছিলেন শের আফগান।

Emperor Jahangir

৭.২ কুতব-উদ-দিন কোকার হত্যা

১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে আকবরের মৃত্যুর পর তার পুত্র সেলিম জাহাঙ্গির উপাধি গ্রহণ করে দিল্লির মসনদে বসেন। শের আফগান ঐ সময় ছিলেন বর্ধমানের ফৌজদার। শোনা যায় তার স্ত্রী মেহেরুউন্নিসা ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। একটি জনপ্রিয় বিশ্বাস অনুযায়ী সেটার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ বা সত্যতা পাওয়া যায় নি, সেটা হলো মেহেরুউন্নিসার বিবাহের আগেই জাহাঙ্গির তার প্রেমে পড়েছিলেন এবং বাদশাহ হওয়ার পর তাঁকে অধিকার করতে চেয়েছিলেন। মেহেরুউন্নিসাকে সহজেই অধিকার করার জন্য জাহাঙ্গির প্রথমে বাংলার শাসক মান সিং-কে আগ্রায় ফিরিয়ে আনেন এবং তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত কুতব-উদ-দিন খান কোকাকে বাংলার শাসক করে পাঠান। যিনি ছিলেন সম্পর্কে তার পালক মায়ের পুত্র। শের আফগানকে তাঁর আনুগত্যের অভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং এই ব্যাপারে আলোচনা করা নিষ্পত্তি করার জন্য কুতব-উদ-দিন বর্ধমানে শের আফগানের মুখোমুখি হন। সেখানে আলোচনার সময় ঝগড়া শুরু হয়ে হাতাহাতি আরম্ভ হয় এবং শের আফগান কুতব-উদ-দিনকে হত্যা করেন, এবং পরে শের আফগান কুতব-উদ-দিনের সঙ্গীদের হাতে নিহত হন। শের আফগানের বিধবাকে আগ্রায় মুঘল বাদশাহি হারেমে নিয়ে আসা হয় এবং এর চার বছর বাদে ১৬১১ সালে জাহাঙ্গিরের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর নতুন নামকরণ হয় নূরজাহান। তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র ধরনের মহিলা এবং আস্তে আস্তে সিংহাসনের পেছনে আসল শক্তি হয়ে ওঠেন এবং ইতিহাসে সম্রাজ্ঞী নূরজাহন বেগম হিসেবে পরিচিতি পান।

৭.৩ ইসলাম খান এর সময়ে মুঘল সাম্রাজ্যের সংহতিস্থাপন ও মুসা খানের বিদ্রোহ

১৬০৮ সালে জুন মাসে জাহাঙ্গির তার বিশ্বস্ত ইসলাম খানকে বাংলার নতুন সুবেদার করে পাঠান। ইসলাম খান প্রথমদিকে রাজা মান সিং-এর সৈন্যবাহিনীতে তার সামরিক দক্ষতা প্রমাণ করেছিলেন, যখন

মুঘল বাহিনী ব্যস্ত থাকতো নানা বিদ্রোহ দমন করার কাজে। তিনি নিজে কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন না কিন্তু তিনি ছিলেন একজন বড় সামরিক কৌশলবিদ। ১৬১৩ সালে যখন তিনি মারা যান, ততদিনে বাংলায় মুঘল প্রশাসন খুব পাকাপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলাম খান যখন বাংলার সুবেদার হিসাবে দায়িত্ব নেন তখন মুঘলরা শুধু রাজধানী রাজমহল থেকে শাসনকার্য চালাতো এবং এছাড়া কতগুলি ভালভাবে সুরক্ষিত থানা বা ফাঁড়ি থাকতো ফৌজদারদের অধীনে।

ইসলাম খানের আগমনের কিছু দিনের মধ্যে অভিজ্ঞ যুদ্ধবাজ উসমান খান সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং হঠাৎ একদিন আক্রমণ করে মুঘলদের আলপসিং (Alapsingh) ফাঁড়ি অধিকার করে। ইসলাম খান অবিলম্বে সৈন্য পাঠিয়ে ফাঁড়ি পুনঃঅধিকার করেন।

এই ঘটনার ফলে বাংলায় মুঘল কর্তৃত্ব যে এখনও নড়বড়ে তার প্রমাণ হয়। ইসলাম খান কতগুলি পদ্ধতিগত পদক্ষেপ নিয়ে সমন্বয় সাধন করেন মুঘল নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করেন এবং শান্তি স্থাপন করেন। তাঁর প্রথম সাফল্য আসে রাজা প্রতাপাদিত্যকে মুঘল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগ দিতে রাজি করানোর মধ্য দিয়ে। ঠিক হয়েছিল রাজা প্রতাপাদিত্য নিজে তার সৈন্যবাহিনী এবং যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে আলিয়াপুরে ইসলাম খানের সাথে যোগ দেবেন এবং বিদ্রোহী মুসা খানের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবেন। প্রতাপাদিত্য-র ছেলে সংগ্রামাদিত্য ইসলাম খানের দরবারে জিম্মিদার হয়ে থাকবেন যাতে প্রতাপাদিত্যর আনুগত্য নিশ্চিন্ত করা যায়।

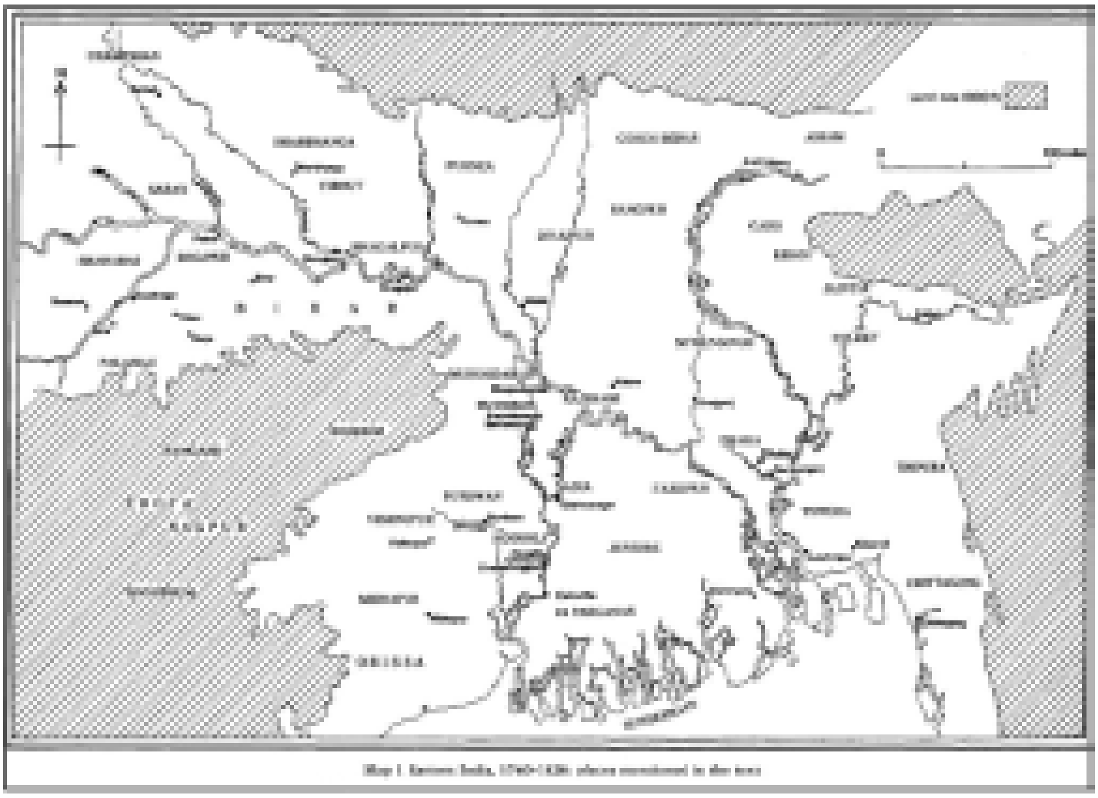

Map of undivided Bengal

বর্ষকালের পরে ইসলাম খান প্রচুর সৈন্য ও নৌবাহিনী ও বড় গাদা নৌকায় প্রচুর বন্দুক, গোলাবারুদ নিয়ে দক্ষিণবঙ্গের দিকে অগ্রসর হন। গৌড়ে পৌঁছে ইসলাম খান তার সৈন্যবাহিনী পাঠান ভাগীরথীর পশ্চিমপাড়ে তিনজন বিদ্রোহী জমিদারের বিরুদ্ধে। এদের মধ্যে রাজা হাম্বির ও সালিম খান বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেন এবং শামশ্ খান ১৫ দিন ধরে যুদ্ধ করার পরে আত্মসমর্পণ করেন। ইসলাম খান আরও দক্ষিণে মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হন এবং পদ্মা নদী পেরিয়ে আলিয়াপুরে পৌঁছান যেটা এখনকার রাজশাহী জেলার মধ্যে অবস্থিত ছিল। সেখানে নানা জমিদার যেমন পুটিয়া, অনন্ত, ভাতুরিয়া বাজার এবং আলিয়াপুরের জমিদার ইলাহি বক্স আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

রাজা প্রতাপাদিত্য কথামতো আতরাইড়ে ইসলাম খানের সাথে যোগ দিলেন। তিনি মুঘলদের সঙ্গে একসাথে মুসা খানের বিরুদ্ধে লড়বেন বলে রাজি হয়েছিলেন এবং ৪০০ যুদ্ধ নৌকার বিশাল নৌবাহিনী পাঠিয়েছিলেন তার পুত্র সংগ্রামাদিত্যর অধিনায়কত্বে, যারা মুঘল নৌবাহিনীর সাথে একসাথে লড়াই করবে। রাজা প্রতাপাদিত্যর যোগদানের ফলে মুঘলদের এতদিন যে সৈন্যবাহিনীতে লোকবলের অভাব ছিল তা পুরণ হলো এবং যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে আফগান বিদ্রোহীর দিকে অগ্রসর হলো দক্ষিণে করতোয়া নদীর অববাহিকা ধরে এবং বাতাসগড়ে এসে পৌঁছালো এখানে পদ্মা নদীর দুটি উপনদী ধলেশ্বরী আর ইছামতির মিলন হয়েছিল। মুঘল নৌবাহিনী এখানে পৌঁছিয়ে নোঙর করে। বাতাসগড়ের কাছে ইছামতির পাড়ে মুসা খান শক্তিশালী দুর্গ বানিয়েছিল, সেটা অধিকার করাই ছিল মুঘল বাহিনীর প্রধান উদ্দেশ্য। মুঘলরা উপুর্যপরি আক্রমণ চালালো দুর্গের উপর এবং নিজেদের ভালোরকম ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে দীর্ঘ যুদ্ধের পরে দুর্গ দখল করলেন। এরপর মুঘলরা ঢাকা অধিকার করে। ঢাকা থেকে ইসলাম খান শ্রীপুর আর বিক্রমপুরের উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী পাঠান। মুসা খান তার রাজধানী সোনারগাঁ রক্ষা করার জন্য লক্ষ্যে নদীতে নৌবাহিনী জড়ো করেন। মুঘল বাহিনী নদীর উল্টোপারে কয়েকদিন অবস্থান করে একদিন রাত্রিবেলা কাটরাবুতে মুসা খানের পৈতৃক বাড়িতে আক্রমণ করে। সংগ্রামাদিত্যের সুযোগ্য পরিলাচনায় মুঘল নৌবাহিনী কত্রাফু অধিকার করে এবং আরও কয়েকটি দুর্গের একটির পর একটির পতন ঘটে কয়েকদিনের মধে, মুসা খান তার রাজধানী সোনারগাঁ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন এবং মুঘলরা সহজেই সোনারগাঁ অধিকার করে। মুসা খান, মেঘনা নদীর একটা চরে আশ্রয় নেন। যেসব জমিদাররা মুসা খানের সঙ্গে ছিল তারা একে একে সবাই মুঘলদের কাছে আত্মসমর্পণ করে, শুধু ভুলয়ার হিন্দু জমিদার রাজা অনন্তমাণিক্য তার আনুগত্য ত্যাগ না করে মুসা খানের জোটেই থেকে যান, মুঘলদের নানা লোভনীয় প্রস্তাব দেওয়া সত্বেও। সুতরাং ইসলাম খান অনন্তমাণিক্যর বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী পাঠান। আরাকানের রাজা অনন্তমাণিক্যর সাহায্যের জন্য অগ্রসর হন। অনন্তমাণিক্য তাঁর দুর্গ থেকে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন এবং মুঘলরা অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে হারাতে না পেরে, তার একজন মুখ্য আধিকারিককে ঘুষ দিয়ে তার সাহায্যে দূর্গের রক্ষণ পেরিয়ে দূর্গ দখল করলো। অনন্তমাণিক্য তার রাজ্য ছেড়ে আরাকানে পালিয়ে গেলেন।

মুসা খান বুঝতে পারলেন মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকরে আর কোন লাভ নেই তখন তিনি আত্মসমর্পণ করলেন। ইসলাম খান উদারতা দেখিয়ে মুসা খানকে তাঁর এলাকাকে জায়গির হিসাবে তাঁকেই বুঝিয়ে দিলেন। জায়গিরদার -এর নিজস্ব সৈন্যবাহিনী আর রইলো না এবং যুদ্ধ জাহাজগুলো মুঘল সৈন্যবাহিনীর

অংশ হয়ে গেল। মুসা খান, ইসলাম খানের দরবারে নজরবন্দি হয়ে রইলেন। এখানেই বাংলায় মুঘলদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটলো।

৭.৪ রাজা প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধ

যদিও পাঠানদের প্রতিরোধ পুরোপুরি শেষ হলো না, ইসলাম খান পাঠানদের উপর পরবর্তী পদক্ষেপ বন্ধ করলেন। তার থেকে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় ছিল যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যকে দমন করা, যিনি আগের প্রতিশ্রুতি মতো মুসা খানের বিরুদ্ধে মুঘলদের সাথে একসাথে যুদ্ধ করার পর যশোরে ফিরে গিয়েছিলেন। প্রতাপাদিত্য বুঝতে পেরেছিলেন যে মুঘলদের আসল উদ্দেশ্য হলো বাংলার সমস্ত পুরোনো শাসকদের মুছে ফেলে সেই জায়গায় পুতুল অধস্তনদের বসানো। এই সূত্রে ইসলাম খান এক বিরাট সৈন্যবাহিনী পাঠালেন প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে এবং একই সঙ্গে আরেকদল সৈন্য পাঠালেন বাকলার রাজা প্রতাপের জামাই রামচন্দ্র-র বিরুদ্ধে। এই বিপুল নৌবহর একইসাথে পদ্মা, জলঙ্গী এবং ইছামতি নদীতে রওনা দিলো এবং সলকা (এখনকার টিবি) যেটি বনগাঁর দশ মাইল দক্ষিণে যমুনা ও ইছামতির নদীর সঙ্গমস্থলের কাছে এসে নোঙর করলো। এখানে প্রতাপাদিত্য-র বড় ছেলে উদয়াদিত্য সৈন্যবাহিনীর বড় অংশের সাথে অপেক্ষা করছিলেন, প্রচুর হাতি, কামান, ৫০০টি গাদাবোট নিয়ে। তিনি মুঘল সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করেন এবং এর ফলে মুঘলদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। কিন্তু ইছামতির দুই পার থেকে মুঘল বাহিনী ভারি গোলাগুলি চালানোর জন্য উদয়াদিত্য তার নৌবাহিনী নিয়ে আর এগোতে পারলেন না এবং সেনাপতি খাজা কামালের নিহত হওয়ায় পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলেন। তাঁর নৌবাহিনীর বেশিরভাগই এবং গোলাবারুদ মুঘলদের হাতে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন।

ইতিমধ্যে বাকলার বিরুদ্ধে অভিযানও সফলভাবে শেষ হলো। এখনকার তরুণ রাজা রামচন্দ্র মায়ের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে মুঘলদের সাথে সন্ধি না করে একটি দুর্গ থেকে প্রায় সাতদিন ধরে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। তারপর দুর্গের পতন হলো এবং রামচন্দ্রের মা মুঘলদের সাথে সন্ধি না করলে বিষ খাবেন বলে রামচন্দ্রকে ভয় দেখালেন। রামচন্দ্র আত্মসমর্পণ করলেন এবং তাকে বন্দি হিসাবে ঢাকায় পাঠানো হলো। অবশেষে বাকলা মুঘল বাদশাহের অংশ হলো। মুঘল বাহিনী আরও পূর্ব দিকে রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর দিকে এগিয়ে গেলো। রাজা প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত বীরত্ব সহকারে মুঘলদের আক্রমণ প্রতিরোধ করলেন তার রাজধানী ধূমঘাটের পাঁচ মাইল দূরের কাগরাঘাটাতে অবস্থিত দুর্গ থেকে। কিন্তু প্রায় এক মাস ধরে প্রতিরোধ করার পরও মুঘলদের উন্নত যুদ্ধ পরিচালনা ও কৌশলের কাছে পরাজিত হলেন এবং আত্মসমর্পণ করলেন। দুপক্ষের মধ্যে ঠিক হয়েছিল যে মুঘল সেনাপতি ঘাইয়ান খান (Ghyan Khan) সম্মানের সাথে রাজা প্রতাপাদিত্যকে ইসলাম খানের সাথে দেখা করতে নিয়ে যাবেন।

উদয়াদিত্য রাজধানী ধূমঘাটে রয়ে যান। কিন্তু বিপরীত মত অনুযায়ী রাজা প্রতাপাদিত্য-র সামরিক দক্ষতা, সাধারণ প্রজাদের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতা দেখে ইসলাম খান রাজা প্রতাপাদিত্যকে গ্রেফতার করার আদেশ জারি করেন এবং প্রতাপের রাজ্যকে মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করেন ভবিষ্যতে বিদ্রোহ যাতে না হয়। প্রচলিত লোককথা অনুযায়ী প্রতাপাদিত্যকে লোহার খাঁচায় বন্দি করে ঢাকা থেকে দিল্লি পাঠানোর সময় যাওয়ার পথে বেনারসে মারা যান।

কিন্তু এর কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাংলা সাহিত্যে প্রতাপাদিত্যকে সত্যিকারের দেশপ্রেমিক হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে, যিনি হানাদার মুঘলদের প্রতিরোধ করেছিলেন। তর্কাতীতভাবে

(Left) Jassheswari Kali Temple built by Raja Pratapaditya at Jessore. (Right) An imaginary portrait of Raja Pratapaditya

প্রতাপাদিত্য ছিলেন একজন শক্তিশালী বীর যিনি গৌরবের সাথে মুঘলদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। আবার 'বৌঠাকুরানির হাট' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিত্রিত প্রতাপাদিত্য ছিলেন একজন আত্মকেন্দ্রিক মানুষ। আবার আরেক রকম প্রচলিত ধারণা অনুসারে রাজা মান সিং-র সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ হয়েছিল এবং যুদ্ধে প্রতাপের পরাজয়ের পরে মান সিং পরিবারের সাথে প্রতাপাদিত্য-র বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। মান সিং যশোরেশ্বরী (মা কালী) মূর্তি আজমেঢ়-এ নিয়ে তাঁর দূর্গে স্থাপন করেন। যদিও মা কালী মূর্তির স্থানান্তর হয়তো সত্যি, কিন্তু মান সিং এর সাথে রাজা প্রতাপাদিত্যের সরাসরি যুদ্ধ হয়েছিল এর কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাইহোক রাজা প্রতাপাদিত্য-র পরাজয়ের বাংলায় মুঘল শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৭.৫ ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তকরণ

ইসলাম খানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তকরণ। সেই সময় রাজমহল বাংলা সুবায় মুঘলদের সদর দপ্তর ছিল। যদিও সুবেদার সবসময়ই ঢাকা শহরে বাস করতেন। প্রথমে মান সিং ১৬০২-১৬০৪, দু বছর ঢাকায় বাস করেছিলেন এবং ঢাকাকে সুরক্ষিত করে তুলেছিলেন। ইসলাম খান একটি নতুন দূর্গ তৈরি করলেন এবং ভাল রাস্তার সাথে একে যুক্ত করলেন। গঙ্গার স্রোতের পরিবর্তনের ফলে বড় যুদ্ধজাহাজ রাজমহল অবধি পৌছাতে পারতো না এবং ঢাকা ছিল কৌশলগতভাবে রাজমহলের থেকে উত্তম জায়গায় অবস্থিত যেখানে থেকে হানাদার মগ এবং পর্তুগিজ

জলদস্যুদের সাথে মোকাবিলা করা যেতো এবং পূর্ব বাংলার রাজস্ব আদায়কে নিয়ন্ত্রণ করা যেত। এই পরিস্থিতিতে এপ্রিল ১৬১২ সালে ইসলাম খান রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় পাকাপাকিভাবে স্থানান্তরিত করেন এবং ঢাকার নতুন নামকরণ করেন বাদশাহ জাহাঙ্গিরের নামে জাহাঙ্গিরনগর।

৭.৬ কামরূপ অভিযান

বাংলায় মুঘলরা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, ইসলাম খান এবার কামরূপের দিকে নজর দিল। কোচবিহারের রাজা কামরূপ রাজ্য জয় করেন এবং কোচবিহার রাজবংশের একটি শাখা সেইসময় স্বাধীন কামরূপ শাসন করতেন, যেটা পশ্চিমে সাঙ্কোনা নদী এবং পূর্বে বারান্দি অবধি বিস্তৃত ছিল। রাজা পরিক্ষীত নারায়ণের বিশাল সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী এবং প্রচুর হাতি ছিল। তিনি মুঘলদের সাথে যুদ্ধ করেন, কিন্তু পরাজিত হন এবং ১৬১৩ সালে কামরূপ বাংলা সুবায় অন্তর্ভুক্ত হয়। ইসলাম খান কোচবিহার আক্রমণ করেন, এবং কিছুটা অংশ অধিকার করেন। তিনি ময়মনসিং এর রাজা সুসঙ্গর রাজপরিবারের কয়েকজনকে বন্দি করেন যিনি প্রথমে মুঘলদের সঙ্গেই ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি কামরূপ আক্রমণ করার চেষ্টা করেছিলেন।

কামরূপ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কিছুদিন পরেই ইসলাম খান ঢাকার কাছে ভাওয়ালে মারা যান। তিনি দেখিয়েছিলেন অতুলনীয় ক্ষমতা, সাহস, রাষ্ট্রনায়কত্ব যা মুঘল শাসন ব্যবস্থাকে পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলায় সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং মান সিং যে চেষ্টা শুরু করেন তাকে সম্পূর্ণ করেন।

৭.৭ কাশিম খান এবং ইব্রাহিম খানের শাসন ব্যবস্থা

ইসলাম খানের ছোট ভাই কাশিম খান বাংলার সুবেদার হন, কিন্তু বড় ভাই ইসলাম খানের তুলনায় তার না ছিল বুদ্ধি বা যোগ্যতা। তিনি রুঢ়ভাবে আধিকারিক এবং পরাজিত রাজাদের সাথে কথা বলতেন। ইসলাম খানের সাথে কোচবিহার রাজা এবং কামরূপ রাজার যে অঙ্গীকার হয়েছিল তিনি তা ভেঙে দেন এবং তাদের বন্দি করেন। এতে দুই রাজ্যেই বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং যা নানারকম অসুবিধা সৃষ্টি করে। কাছাড়ের রাজা শত্রুদমনের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয়, যিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, কিন্তু মুঘল বাহিনীর এই অভিযান সফল হয়নি এবং রাজা শত্রদমন বহুদিন তাঁর স্বাধীনতা বজায় রাখেন। বীরভূমের জমিদাররা বিদ্রোহ করেন, কাশেম খান তার বিরুদ্ধে সৈন্যদল পাঠান কিন্তু তা বিফলে যায়। ভুষণা এলাকা আরাকানের রাজা এবং পর্তুগিজ জলদস্যু সেবাসটিয়ান গঞ্জালেস যৌথ ভাবে আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করে। পর্তুগিজ জলদস্যুরা সন্দীপ দ্বীপ দখল করে রেখেছিলেন। পরের বছর আরাকান রাজা আবার আক্রমণ করে, কিন্তু এইবার মুঘল ধূর্ততার কাছে পরাজিত হয়।

কাশেম খান আসাম বিজয়ের জন্য সৈন্যবাহিনী পাঠান কিন্তু আসামের রাজা মুঘলদের পরাজিত করেন। চট্টগ্রাম এ একটি সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয়, তারাও পরাজিত হয়ে ফিরে আসে। এই সমস্ত বিপরীত ঘটনায় মুঘল শাসন ব্যবস্থা কাশেম খানের সময় (১৬১৪-১৭) দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

এরপরের সুবেদার ইব্রাহিম খানের সময় মোটামুটি বাংলায় শান্তি, শৃঙ্খলা এবং মুঘল শাসন ব্যবস্থার সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ইব্রাহিম খান দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন যখন রাজপুত্র খুররাম (শাহজাহান) তার পিতা জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহ করেন। রাজকীয় বাহিনীর কাছে পরাজিত হবার পর রাজকুমার খুররাম বাংলার দিকে পাশ্চাদপসরণ করেন। পুরোনো শত্রু মুসা খানের পুত্র তার সাথে যোগ দেন, এছাড়া মুঘলদের ঘোষিত শত্রু আরাকানের রাজা এবং পর্তুগিজ জলদস্যুর দল তাকে সমর্থন করে। ইব্রাহিম খান প্রথমে একটু ইতঃস্তত করেন রাজপুত্রের সাথে যুদ্ধ করতে, কিন্তু খুররাম যখন রাজমহল অধিকার করে তখন দায়িত্ববান হিসাবে তিনি খুররামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হন। যুদ্ধে ইব্রাহিম খান পরাজিত এবং নিহত হন। রাজধানী জাহাঙ্গিরনগর কিছুদিনের জন্য অধিকার হয়, এবং খুররাম স্বাধীন রাজা হিসাবে রাজত্ব পরিচালনা শুরু করেন (১৬২৪)। তিনি ইতিমধ্যেই ওড়িশা অধিকার করেছিলেন এবং এর পরে বিহারের কিছু অংশ ও অওধ অধিকার করেন। কিন্তু এর কিছুদিন পরেই জাহাঙ্গিরের রাজকীয় বাহিনীর কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন (অক্টোবর ১৬২৪) এবং দাক্ষিণাত্যের সুবেদার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গিরের মৃত্যুর পর খুররাম দিল্লির সিংহাসনে বসেন।

৭.৮ উপসংহার

সপ্তদশ শতকের প্রথম অর্ধের মধ্যে বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আকবর এবং মান সিং-এর চেষ্টায় বাংলায় যে অঞ্চলে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই সমস্ত অঞ্চলই পরের সুবেদাররা সাফল্যের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমর্থ হয়েছিল, যদিও মাঝে মাঝে মুসা খান এবং রাজা প্রতাপাদিত্যের বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়েছিল।

৭.৯ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. ইসলাম খান কীভাবে বাংলায় মুঘল শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? এই প্রসঙ্গে মুসা খানের বিদ্রোহ সম্বন্ধে লিখুন।

২. কী কী কারণে রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়েছিল?

৩. সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার জন্য রাজা প্রতাপাদিত্যের সংগ্রাম সংক্ষেপে বর্ণনা করো, শেষ পর্যন্ত কী ঘটেছিল?

৪. আপনি কি বিশ্বাস করেন যে রাজা প্রতাপাদিত্য একজন "সত্যিকারের বাংলার দেশপ্রেমিক" ছিলেন যিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন মুঘল আক্রমণ থেকে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে?

৫. ইব্রাহিম খান ও কাশিম খানের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখুন।

৭.১০ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Chandra, Satish, *History of Medieval India* (N. Delhi : Orient Blackswan Pvt. Ltd. 2007).

Sarkar, Jadunath (ed), *A History of Bengal Muslim Period* (Vol-II) (1200-1757 AD) (N. Delhi, B. R. Publishing Corporation, 2017).

Sengupta, Nitish, *Land of two rives, A history of Bengal from Mahabharata to Mujib*, (N. Delhi : Penguin Books, 2017.

একক ৮ ❑ ঔরঙ্গজেবের অধীনে বাংলা

গঠন

৮.০ উদ্দেশ্য
৮.১ ভূমিকা
৮.২ পর্তুগিজ এবং বার্মার অহোমদের সাথে সংঘর্ষ
৮.৩ শাহ সুজার উত্থান ও পতন
৮.৪ নতুন সুবেদার মিরজুমলা এবং তার সঙ্গে কোচবিহারের সংঘর্ষ
৮.৫ সুবেদার শায়েস্তা খানের অধীনে বাংলা (১৬৬৪-৮৮)
৮.৬ উপসংহার
৮.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী
৮.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৮.০ উদ্দেশ্য

- আলোচ্য অংশের উদ্দেশ্য পূর্ব ভারতের ইতিহাসের বর্ণনা এবং বিশেষভাবে ১৫৭৫ থেকে ১৭৫৭ অবধি বাংলা ইতিহাসের বর্ণনা।
- মুঘলদের সাথে পর্তুগিজ এবং অহোমদের সংঘর্ষের আলোচনা।
- বাংলায় শাহ সুজা, মিরজুমলা এবং শায়েস্তা খানের ইতিহাস, শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে এই অংশে।

৮.১ ভূমিকা

১৬২৮ সালে শাহজাহানের সিংহাসনে আরোহণের সময় থেকে ১৭০৭ সালে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু অবধি সমগ্রভাবে বাংলায় শান্তি, সমৃদ্ধির প্রাধান্য পেয়েছে। তিনজন প্রধান সুবেদার যারা বাংলাকে এই পর্যায়ে বৃহত্তর সময় শাসন করেছে তারা হলেন শাহজাহান পুত্র সুজা (১৬৩৯-৫৯), শায়েস্তা খান (১৬৬৪-৮৮) এবং ঔরঙ্গজেবের নাতি আজিম-উশ-শান (১৬৯৭-১৭১২)।

৮.২ পর্তুগিজ এবং বার্মার অহোমদের সাথে সংঘর্ষ

শাহজাহানের রাজত্বে একদম প্রথমেই পর্তুগিজদের হুগলি বন্দর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। (Partuguese : Parto Piqueno, 1632)। আকবর এবং জাহাঙ্গির দুজনই মন্টসরাট (Montserrat)-র

সময় থেকে পর্তুগিজদের বিভিন্ন সুযোগ দিয়েছিলেন যেমন সামুদ্রিক বাণিজ্যের নিরবচ্ছিন্ন অধিকার, বাংলায় অস্থায়ী বসতি তৈরি করার অধিকার। ফলে বাংলায় হুগলি, চট্টগ্রাম, সাতগাঁও-তে পর্তুগিজদের বেশ কিছু বসতি এবং কুঠি গড়ে ওঠে।

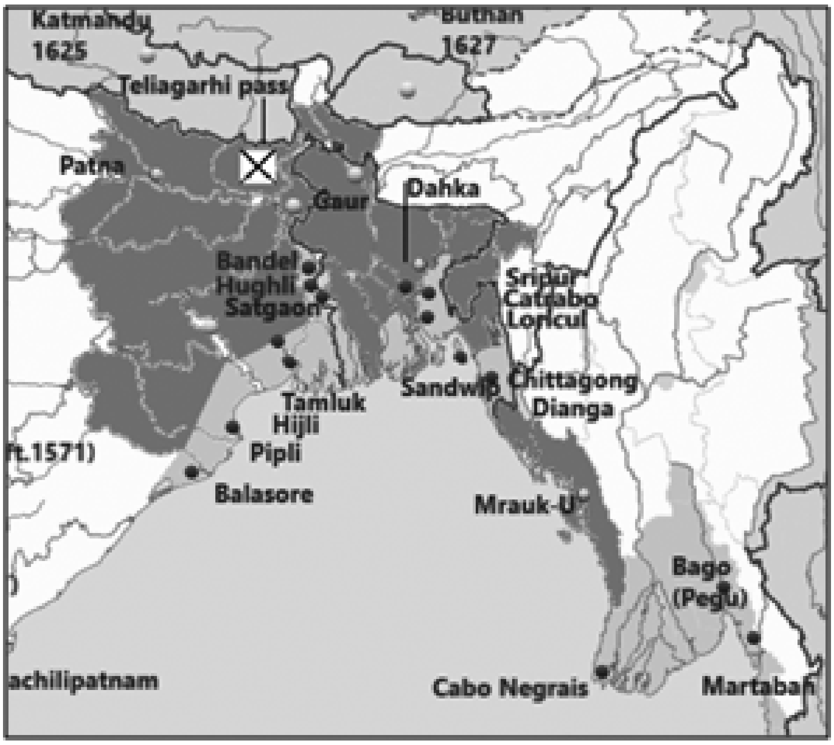

Various Portuguese outposts and settlements in Bengal province

যদিও, পর্তুগিজদের এই অঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন জবরদস্তিমূলক আচরণের জন্য কুখ্যাত হয়ে উঠেছিল। বাণিজ্য জাহাজের লুণ্ঠন, সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য স্থানীয় মানুষদের জোর করে দাসত্ব করানো এবং একই সঙ্গে নির্বিচারে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা—এই সবই ছিল তাদের কাজের অঙ্গ। অতি অল্প সময়ে পর্তুগিজরা সম্পদশালী হয়ে উঠেছিল, এবং স্থানীয় মানুষদের কাছে ফিরিঙ্গি ডাকাত নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। তাই বাদশাহ শাহজাহান তাঁর রাজত্বের প্রথমদিকেই বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খানকে আদেশ দেন পর্তুগিজদের বাংলা থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য। হুগলি বন্দর ১৬৩২ সালে পর্তুগিজরা অধিকার করেছিল। ঔরঙ্গজেবের শাসনকালের মধ্যেই সমস্ত পর্তুগিজ জলদস্যুদের একদম চট্টগ্রাম বন্দর অবধি সব জায়গায় থেকে উৎখাত করা হয়েছিল, পর্তুগিজদের প্রচুর সংখ্যক জাহাজ মুঘল এবং স্থানীয় জমিদার বাহিনী পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

আসামের অহোমদের সাথে মুঘলদের যুদ্ধ হয়। ১৬১৫ সালে অহোম রাজার হাতে মুঘলরা পরাজিত হয়েছিল। এরপরেই ১৬১৫ সালের শেষে কামরূপের রাজা পরীক্ষিৎনারায়ণের মৃত্যুর পরে বিদ্রোহ শুরু

হয়। রাজার ছোট ভাই বলিনারায়ণ অহোম রাজার কাছে আশ্রয় নেন, এর ফলে অহোম রাজার সঙ্গে বাংলার মুঘল শক্তির যুদ্ধ শুরু হয়। বলিনারায়ণ একটা সময়ে মুঘলদের হটিয়ে কামরূপের মুঘল ফৌজদারকে বন্দি করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুঘলরাই বিজয়ী হয়, কামরূপ পুনঃবিজয় হয়েছিল এবং অহোম রাজার সাথে একটি সন্ধিচুক্তি (১৬৩৮) স্থাপনের মাধ্যমে যুদ্ধ শেষ হয়েছিল। সন্ধির চুক্তি অনুযায়ী উত্তরে বারাণ্ডি নদী এবং দক্ষিণে আসুরালি নদী বাংলা এবং কামরূপের মধ্যে সীমানা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল।

৮.৩ শাহ্ সুজার উত্থান এবং পতন

মুঘলদের ঐতিহ্য ছিল, গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যগুলোর সুবেদার পদে রাজ পরিবারের সদস্যদেরই নিয়োগ করা হত।

শাহজাদা মহম্মদ শাহ সূজা ছিলেন মুঘল বাদশাহ শাহজাহান আর রানি মুমতাজ মহলের দ্বিতীয় সন্তান। শাহজাহান, শাহ সূজাকে বাংলা এবং বিহারের সুবেদার হিসাবে ১৬১৪ সালে নিয়োগ করেন এবং ২৫শে জুলাই ১৬৪৮ সাল থেকে ওড়িশারও যুক্ত হয় এবং ১৬৬১ পর্যন্ত এই শাসন ব্যবস্থাই বজায় থাকে। শাহজাহান নাগপুরের রাজপুত রাজকুমার কানওয়ার রাঘব সিং-কে শাহ সুজার সহকারী সুবেদার হিসাবে নিয়োগ করেন (১৬১৬-১৬৭১) শাহ সূজার দীর্ঘ শান্তিপূর্ণ শাসনে ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্পে বাংলা সমৃদ্ধ এবং উন্নতি লাভ করেছিল এবং অর্থনৈতিক সাফল্যে শক্তিশালী রাজ্য হয়ে উঠেছিল। রাজধানী ঢাকাতে তিনি সরকারি আবাসন 'বরা কাটরা' তৈরি করেছিলেন।

Prince Shah Shuja

১৬৫৮ সালে বাদশাহ শাহাজাহান গুরতর অসুস্থ হয়ে পড়েন, এই সুযোগে শাহাজাহানের চার পুত্র যথা দারা, সুজা, ঔরঙ্গজেব এবং মুরাদের মধ্যে সিংহাসনের অধিকার নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়। এই যুদ্ধে ঔরঙ্গজেব প্রথমে মুরাদের সাথে দলবদ্ধ হয়ে দারাকে পরাজিত করেন। বাদশাহ শাহাজাহানকে আগ্রায় দুর্গে বন্দি করে রাখা হয়। ঔরঙ্গজেব শাহ সুজাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন বাংলা ও বিহারের অধিকার ধরে রাখার জন্য। কিন্তু সুজা তার ভাই ঔরঙ্গজেবকে চ্যালেঞ্জ করে আগ্রার দিকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন, কিন্তু ১৬৫৯ সালে খাজুয়া (১৬৫৯) যুদ্ধে ঔরঙ্গজেবের বাহিনীর হাতে পরাজিত হন। মুঘল সেনাপতি মিরজুমলা তাঁকে অনুসরণ করে ঢাকায় দখল করেন (১৬৬০), সুজা পালিয়ে ২৬শে অগাস্ট ১৬৬০ সালে আরাকানের রাজধানীতে পৌছান, সেখানে আরাকান রাজা তাকে সম্মানের সাথে অভিবাদন করে আশ্রয় দেন। শক্তিশালী আরাকান রাজা সান্ডা থুডম্মা (Sanda Thudhamma) প্রাথমিকভাবে সুজা এবং তার পরিবারকে মক্কা যাওয়ার জন্য জাহাজ দিতে রাজি ছিলেন, শাহ সুজার পরিকল্পনা ছিল শেষ জীবনের অবধি পরিবার নিয়ে মক্কায় বসবাস করা। ৬টি উটের পিটে বোঝাই করে সোনা এবং প্রচুর ধনরত্ন সুজা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, এত ধনরত্ন আরাকানরা আগে কখনও একসাথে দেখেনি। কিন্তু এর কিছু মাস বাদে সুজা নিহত হন সেই আরাকানদের হাতেই (১৬৬১) আরাকান রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে।

৮.৪ নতুন সুবেদার মিরজুমলা এবং তার সঙ্গে কোচবিহারের সংঘর্ষ

১৬৬০ সালের জুন মাসে মিরজুমলা বাংলার সুবেদার হিসাবে নিযুক্ত হন। যখন সুজা ঔরঙ্গজেবের সাথে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন তখন সেই সুযোগে কোচবিহারের রাজা কামরূপ অধিকার করেন। ঠিক সেইভাবেই অহোম রাজা (মার্চ, ১৬৫৯) গৌহাটি অধিকার করেন। এই দুই রাজাই পরবর্তীকালে পরাজিত হন। প্রথমে অহোম রাজা কোচবিহারের রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং জোর করে কামরূপ অধিকার করেন (মার্চ, ১৬৬০)।

বাংলা সুবার দায়িত্ব নিয়ে, মিরজুমলা কামরূপ এবং কোচবিহারের বিরুদ্ধে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী পাঠান (১৬৬১)। কোচবিহারের রাজা পালিয়ে যান এবং রাজ্য সহজেই অধিকার হয়। সৈন্যবাহিনী অহোম রাজার দিকে অগ্রসর হয়। তিনিও পালিয়ে যান, তাঁর রাজ্যও মিরজুমলা অধিকার করেন (মার্চ, ১৬৬২)। সে বছর প্রচণ্ড বর্ষার জন্য গোটা দেশে বন্যার কবলে পড়ে। মুঘলদের ফাঁড়িগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফাঁড়িগুলোতে রসদ পৌছানো অসম্ভব হয়ে পড়ে বন্যায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায়। মুঘল তাঁবুগুলো জলমগ্ন হয়ে যায়, প্রচুর ঘোড়া অনাহারে মারা যায়, মহামারি শুরু হয়। এই সুযোগ নিয়ে অহোম রাজা বারবার মুঘল ফাঁড়িগুলোতে আক্রমণ করেন। বর্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পর স্বস্তি আসে। মিরজুমলা পুনরায় অহোম রাজার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এই অবস্থায় তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন, এবং তিনি বাধ্য হন অহোম রাজার সাথে সন্ধি করতে এবং বাংলায় সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরে আসেন। ঢাকা পৌছানোর কয়েক মাইল বাকি থাকতে রাস্তায় মিরজুমলা মারা যান (মার্চ, ১৬৬৩), এই ডামাডোলে কোচবিহারে রাজা তার রাজ্য পুনঃঅধিকার করেন, যদিও পুরো রাজ্য অধিকার করতে সক্ষম হননি।

বিচ্ছিন্নভাবে কিছু এলাকা মুঘলদের হাতে থেকে যায় এবং কিছু এলাকা কোচ রাজার আনুগত্য মেনে নেয়। সেইভাবে কোচবিহারের উত্তরে কিছু এলাকা আবার মুঘলদের আনুগত্য মেনে নেয়।

৮.৫ সুবেদার শায়েস্তা খানের অধীনে বাংলা (১৬৬৪-৮৮)

১৬৬৪ সালে সুবেদার শায়েস্তা খান বাংলায় দায়িত্ব পান। তিনি বাংলায় দীর্ঘ ২৪ বছর শাসন করেন। তিনি রাজকীয় মহিমায় আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করতেন এবং মানুষকে একরকম লুণ্ঠন করে প্রচুর অর্থ এবং সম্পদ দিল্লীর বাদশাহকে পাঠিয়ে তাকে সন্তুষ্ট রাখতেন। একচেটিয়া বাণিজ্য থেকে প্রচুর লাভ হত যা শায়েস্তা খান আত্মসাৎ করতেন। সমসাময়িক ইংরেজ ব্যবসায়ী তাঁর লোভ সম্বন্ধে বলেছেন যে সুবেদার হওয়ার পর প্রথম ১৩ বছরে শায়েস্তা খান ৩৮ কোটি টাকা সোনা সঞ্চয় করেছিলেন। তার প্রতি দিনের রোজগার ছিল ২ লাখ টাকা এবং প্রতিদিন তিনি ১ লাখ টাকা খরচ করতেন।

শায়েস্তা খান নিজে কখনও যুদ্ধে অংশ নিতেন না। তিনি হারেমে প্রচণ্ড আরামে দিন কাটাতেন, কিন্তু তাঁর ক্ষমতা ছিল ঠিক কর্মচারীকে খুঁজে বের করা যে শক্ত হাতে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করবে এবং দক্ষতার সাথে যুদ্ধ করতে পারবে। তিনি পুনরায় কোচবিহারকে মুঘল অধীনতা মানতে বাধ্য করে বিদ্রোহী রাজাকে হঠিয়ে দেন, এবং বিভিন্ন জায়গায় বিদ্রোহ দমন করেন। তাঁর শাসনকালে প্রধান ঘটনা চট্টগ্রাম বিজয়, যেটা আরাকানের রাজা পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে দখল করে রেখেছিল এবং যেটা মুখ্য কেন্দ্র ছিল যৌথভাবে আরাকানি মগ এবং পর্তুগিজ জলদস্যুদের। শায়েস্তা খান প্রথম অধিকার করেন সন্দীপ দ্বীপ (নভেম্বর ১৬৬৫) যেটা ব্যবহার হত ডাকাতি ও ক্রীতদাস কেনাবেচার জন্য। এই সময়ে মধ্যে মগ ও পর্তুগিজরা ছড়িয়ে পড়ে। শায়েস্তা খান পর্তুগিজদের পরাস্ত করেন ঘুষ এবং তাদের আশ্রয় দেবার বিনিময়ে। চট্টগ্রামের সমস্ত ফিরিঙ্গি এবং তাদের পরিবারকে মুঘল শাসিত এলাকায় আশ্রয় দেওয়া হয়। এদের সাহায্য নিয়েই তিনি চট্টগ্রাম জয় করেন (১৬৬৬) ঔরঙ্গজেবের আদেশ অনুযায়ী। চট্টগ্রামের নতুন নামকরণ হয় ইসলামাবাদ এবং একজন মুঘল ফৌজদারকে সেখানে নিয়োগ করা হয়। একইসঙ্গে হুগলি বন্দরে ইংরেজ বণিকদের সাথে শায়েস্তা খান গণ্ডগোল জড়িয়ে পড়েন, ইংরেজ বণিকরা তাদের পণ্যে শুল্ক রদ করার দাবি করেন যেমন শায়েস্তা খান তার পণ্যে কোনো শুল্ক দিতেন না। কিন্তু এই ঝগড়ার কোনো মীমাংসা হয়নি। ইংরেজরা অধৈর্য্য হয়ে মুঘল বাদশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মুঘলরা হুগলিতে ইংরেজদের কুঠিগুলি আক্রমণ করে এবং ইংরেজদের বাধ্য করে সেগুলো খালি করতে এবং তাদের জাহাজ এবং নৌকাগুলি নদী থেকে সরিয়ে দিতে। ইংরেজরা প্রাণপণ চেষ্টা করে চট্টগ্রাম অধিকার করতে এবং শেষ পর্যন্ত নদীর মুখে হিজলিতে আশ্রয় নেয়।

আলোচনা শেষ পর্যায় ফলপ্রসু হয় এবং ১৬৯০ সালে ইংরেজরা অনুমতি পায় বাংলায় পুনরায় কুঠি স্থাপন করার তবে নতুন জায়গায় কলকাতায়।

জুন, ১৬৮৮ সালে বাংলায় শায়েস্তা খানের শাসন শেষ হয় কিন্তু বাংলায় এখনও তাকে মনে আছে। কথিত আছে তাঁর শাসন ব্যবস্থা সময় চাল এক টাকায় ৮ মন পাওয়া যেতো। পূর্ব বাংলায় বিশাল চাল উৎপাদন হত এবং চালের দামকে যদি একক ধরা হয় তাহলে সেইসময় শায়েস্তা খানের দিনে রোজগার ছিল ২ লাখ টাকা। শায়েস্তা খানের ব্যাপক জনপ্রিয়তা আরও কারণগুলো হলো নানা ধরনের আড়ম্বর

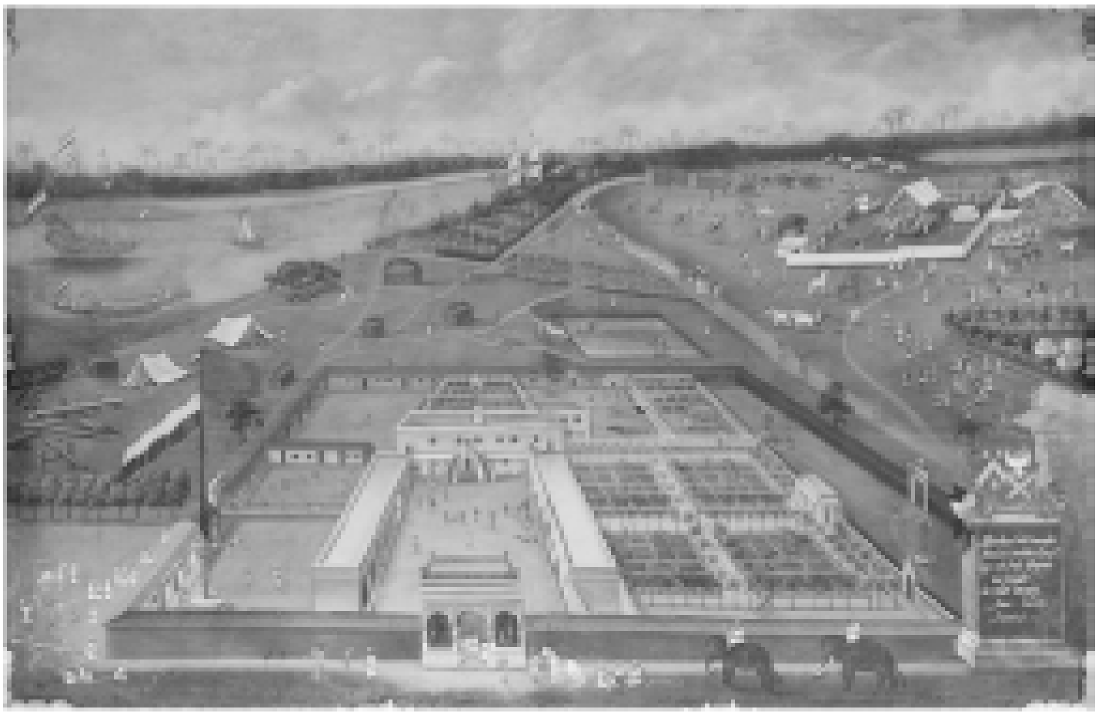

An imaginary portrait of a typical European factory settlement in Bengal

ও মহিমা মণ্ডিত কার্যক্রম অনুষ্ঠিত করা, উদার উপহার, চাঁদা দেওয়া এবং দুঃস্থকে সাহায্য করা। এই সমস্ত উদারতা তিনি তার প্রতিদিনের ১ লাখ টাকার মাধ্যমেই খরচ করতেন। মুঘল বাদশাহের রাজকার্য চালাবার জন্য বাংলার পাঠানো বিপুল রাজস্বের উপরই প্রধানত নির্ভর করতো। বাংলা সুবার নির্দিষ্ট দেওয়া রাজস্বের থেকে অনেক বেশি রাজস্ব মুঘল বাদশাহকে পাঠানো হত। বাংলায় তৈরি হত সূক্ষ্ম মসলিন; এছাড়া বাংলার ব্যবসায়ীরা নৌবাণিজ্য সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে যা বিদেশিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত।

পরের সুবেদারদের শাসনকালে মাঝে মাঝে গণ্ডগোল হত। সুবেদার ইব্রাহিম খানের বেশির ভাগ মেয়াদই বিদ্রোহী মেদিনীপুরের জমিদার শোভা সিং এবং ওড়িশার রহিম খান পাঠান দমন করতেই কেটে যায়। শেষে বৃদ্ধ বাদশাহ ঔরঙ্গজেব তার নাতি আজিম-উস-সান (১৬৯৭-১৭১২)-কে বিদ্রোহ দমন করতে পাঠান, যা তিনি সাফল্যের সাথে পালন করেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের শাসনের শেষ ভাগে (১৭০০-০৭) আজিম-উস-সান ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর অবস্থার ভয়ে সম্পদ ও অর্থ উপার্জন শুরু করে বিভিন্ন অসাধু উপায় অবলম্বন করে এবং সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করে। এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নেয় তরুণ দেওয়ান মুর্শিদকুলি খান। তিনি নতুন বাদশা বাহাদুর শাহ (১৭০৭-১২)-র সাথে ভাল সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং দিল্লির অনুমতিক্রমে নিজে প্রায় স্বাধীন নবাব হন ১৭১৭ সালে।

৮.৬ উপসংহার

সব মিলিয়ে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের সময়ে বাংলা সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধি ঘটে, যদিও বিচ্ছিন্ন কিছু গোলযোগ যেমন শাহ সুজার পতন, অহোম এবং কোচবিহারের বিদ্রোহ। মুঘল শাসকদের অধীনে সুবেদাররা আধা স্বায়ত্ব শাসন চালাতো এবং তারা বেশিরভাগ রাজ পরিবারের সদস্য ছিল। তারা এই পারিবারিক স্বাধীনতা উপভোগ করতো, কিন্তু এরপরে নবাবরা কিন্তু রাজ বংশগত হত না। এই সময়ে প্রথম ইউরোপিয়ান নৌশক্তি সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয় বিশেষ করে পর্তুগিজ এবং ব্রিটিশদের সঙ্গে। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সম্পদশালী রাজ্যগুলির উপর মুঘল নিয়ন্ত্রণ আস্তে আস্তে কমতে থাকে।

৮.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. সতেরশ শতকের মধ্যভাগে বাংলায় মুঘলদের সাথে পর্তুগিজ এবং অহোমদের সংঘর্ষ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

২. শাহ সুজার উত্থান ও পতন সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখুন।

৩. মুঘল-কোচবিহার দ্বন্দ্ব বর্ণনা করুন।

৪. শায়েস্তা খান কে ছিলেন? তিনি কেন এবং কীভাবে বাংলায় নানা ইউরোপিয়ান শক্তির সাথে যেমন ব্রিটিশ এবং পর্তুগিজদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন?

৫. সপ্তদশ শতকে বাংলা কী করে সমৃদ্ধশালী রাজস্ব উৎপাদন রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

৮.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Chandra, Satish, *History of Medieval India* (N. Delhi : Orient Blackswan Pvt. Ltd. 2007).

Sarkar, Jadunath (ed), *A History of Bengal Muslim Period* (Vol-II) (1200-1757 AD) (N. Delhi, B. R. Publishing Corporation, 2017).

Sengupta, Nitish, *Land of two rives, A history of Bengal from Mahabharata to Mujib*, (N. Delhi : Penguin Books, 2017.

পর্যায়-৩
মধ্যযুগের বাংলা : রাজনৈতিক বিকাশ (১৭০১-১৭৫৭)

একক-৯ ❑ মধ্যযুগে বাংলার নগরায়ণ

গঠন

৯.০ উদ্দেশ্য
৯.১ ভূমিকা
৯.২ লক্ষণাবতি : তৎকালীন বাংলার রাজধানী ও প্রধান বাণিজ্যনগরের সামগ্রিক রূপ
৯.৩ সাংস্কৃতিক পরিসর : বাংলায় সুফিদের প্রভাব
৯.৪ বাংলার টাঁকশাল নগরী
৯.৫ ব্যবসা এবং বাণিজ্য
৯.৬ উপসংহার
৯.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী
৯.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৯.০ উদ্দেশ্য

- আলোচ্য অংশে বাংলার নগরায়ণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে।
- দুটি প্রাথমিক বা মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি সবার দৃষ্টিগোচর করা হবে।
  - ☞ মধ্যযুগের বাংলায় বাণিজ্যিক শহরের বিকাশ
  - ☞ নগরায়ণে সুফি সন্তদের ভূমিকা

৯.১ ভূমিকা

বাংলায় মুসলিমদের আগমনের সময় পুরনো শহরগুলো ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় ছিল, যেমন লক্ষণাবতি, সাতগাঁও, সোনারগাঁও, এবং পাড়ুয়া। মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসে ঐতিহাসিকরা দেখেছেন ১৩শ শতকে মুসলিম অভিজাত শ্রেণি আবির্ভাবে শহর পরিকল্পনায় এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছিল। M. Habib একজন এই বিষয়ে অগ্রণী ঐতিহাসিক বলেছেন এই নগর বিপ্লব প্রধানত নির্ভর করেছিল বৃদ্ধি এবং গুণগত মানের উপর। আরেকজন ঐতিহাসিক K.A. Nizami বলেছেন যে তুর্কি অধিগ্রহণের পরে পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রাক্-মুসলিম যুগের নগর পরিকল্পনার সমাপ্তি। আবার K. M. Asharf নগরায়ণে মুসলিম অবদান সম্বন্ধে বলেছেন, যে নতুন তুর্কি শাসকরা নগরায়ণে অবদান বলতে শুধু

প্রাসাদ, মসজিদ, পুকুর খনন করেছিলেন বাদবাকি নাগরিক সুবিধা পুরনো হিন্দু শহরে আগে থেকেই ছিল।

যাই হোক, কৃষি অর্থনীতির বিকাশ, জমি অধিগ্রহণ এবং নৌবাণিজ্যের সুবাদে ১৪শ শতকে সুলতানি রাজত্বে বাংলায় নগরায়ণে এক লক্ষণীয় পরিবর্তন হয়। এখন দেখা যাক মধ্যযুগে বাংলায় নগরায়ণ পরিকল্পনায় কী কী কারণ হয়েছিল এবং প্রভাবে ঘটেছিল।

৯.২ লক্ষণাবতি : তৎকালীন বাংলার রাজধানী ও প্রধান বাণিজ্য নগরের সামগ্রিক রূপ

লক্ষণাবতি, গৌড় নামেই পরিচিত, গঙ্গার উত্তরে এবং এখনকার পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলায় অবস্থিত। এটা তৈরি হয়েছিল বাংলায় মুসলিমদের আগমনের আগে সেন রাজাদের সময়,-সম্ভবত সেন বংশের বল্লাল সেনের হাতে। গৌড় কয়েক শতাব্দী ধরে সেন রাজাদের রাজধানী ছিল এবং তাদের সময়

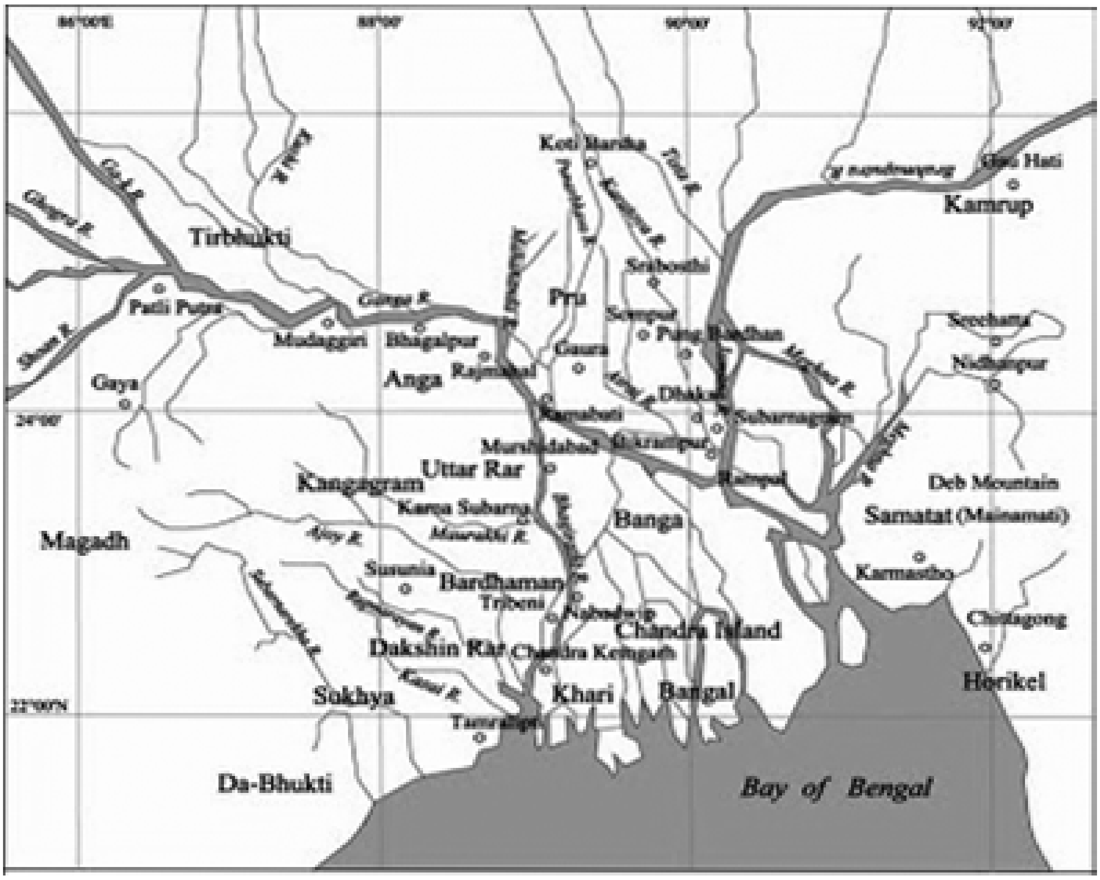

Some urban centers of Early Medieval Bengal

বিশেষভাবে সমৃদ্ধ ছিল। তুর্কিদের আক্রমণের পরে লক্ষণাবতি পুরো সুলতানি শাসনের সময়কালে মুসলিম প্রশাসনের সমস্ত কার্যক্রমের সদর দপ্তর ছিল। গৌড় রাজ্যের রাজধানী ছিল প্রায় ২৫০ বছর, বখতিয়ার খিলজির (১২০৬-১১) সময় থেকে কাদের খান (Qader Khan) (১৩২৬-৪১) এর সময় অবধি এবং পরে আবার নাসিরুদ্দিন মামুদের সময় অবধি। সেন রাজাদের সময়ই লক্ষণাবতি ব্যবসা ও বাণিজ্যের একটা বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। সেইজন্য যখন মহম্মদ বখতিয়ার খিলজি খুব সামান্য সৈন্যদল (২০০জন) নিয়ে শহরে প্রবেশ করেছিল, তখন সবাই তাদের ব্যবসায়ী হিসাবে ভেবেছিল। জিয়া-উদ-দিন বারুনি লিখেছেন লক্ষণাবতি বাজার অন্তত ১ মাইল লম্বা ছিল, রাস্তার দুপাশে ব্যবসায়ী দোকানদাররা তাদের পণ্য বিক্রয় করতো। বহু বিদেশিরা লক্ষণাবতি বাস করতো। অনেকে বাস করতো ব্যবসার সুবিধার্থে এবং বাকিরা প্রশাসনের কর্মী হিসাবে বাস করতো। বহু লোক সেখানে বসতি স্থাপন করেছিল, ভালভাবে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য। প্রাক্-মুসলিম যুগে যে কোন ব্যবসা কেন্দ্রে এটাই স্বাভাবিক ছিল। মানুষ প্রধানত অতিথিবৎস ছিল এবং বিদেশি অভিবাসী যারা অনুন্নত পশ্চিম এবং মধ্য এশিয়া থেকে আসতো তাদের জন্য ভাল আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতো। খলজি (Khaljis), ইসপানিয়ান (Isfahanis), সিসতানিস (Sistanis), আবেসিনিয়ান (Abyssanians) এবং আফগানরা বাংলায় এসেছিল। বখতিয়ার খিলজি আসার আগে। এদের মধ্যে অনেকেই বাংলায় থেকে গিয়েছিল, এরা বড় পদে চাকরি করতো, এমনকি এদের মধ্যে কেউ গর্ভনরও হয়েছিল।

সুলতানি যুগে লক্ষণাবতির গুরুত্ব ব্যবসায়িক কেন্দ্র হিসাবে আরও বৃদ্ধি পায়। একজন পর্তুগিজ ঐতিহাসিক Joas de Barros বর্ণনা দিয়েছেন রাস্তাগুলো ছিল চওড়া এবং লম্বা এবং প্রধান রাস্তার দুপাশে গাছ রোপণ হত এবং ছাউনি দেওয়া হত পথচারীদের ছায়া দেবার জন্য, জনসংখ্যা ছিল যথেষ্ট বেশি। রাস্তায় ভিড় লেগে থাকতো এবং যানবাহনের ভিড়ে একজন আরেকজনকে পেরিয়ে যাতায়াত করতে পারতো না। আরেকজন ইউরোপিয়ান, Vertheir, যিনি ১৫০৮-এ গৌড় ভ্রমণ করেছিলেন, তিনি বলেছেন শহরের জনসংখ্যা প্রায় ৪০,০০০-র উপরে ছিল এবং শহরে বেশ কিছু ধনী ব্যবসায়ী বাস করতো সেই সময়। এর ঠিক এক দশক পরে Durate Barbosa লিখলেন, ধনী আরবি, ইরানি, আবেসিনিয়ান এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীরা গৌড়ে বাস করতেন। ১৫২১-এ পর্তুগিজ রাজদূত গৌড়ে দেখেছিলেন রাস্তা এবং সড়কগুলো ইট দিয়ে পাকা করা যেমন পর্তুগালের রাজধানী লিসবনের নতুন রাস্তাগুলিতে ছিল। বাজার সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল এবং সবকিছুই খাবার এবং বিভিন্ন পণ্য প্রচুর পরিমাণে এবং ন্যায্য দামে পাওয়া যেতো। রাস্তা এবং লেনগুলিতে এত ভীড় থাকতো যে যাতায়াত করা খুব কঠিন ছিল। সমস্ত রকমের অস্ত্র, তরোয়াল, বর্শা-বল্লম, পুরুষদের বস্ত্র, রুপো খোদিত বর্ম, শিরস্ত্রাণ এবং সমস্ত কিছুই রাস্তার দুপাশের বাজারে বিক্রি হত। এছাড়া অশ্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম রাখবার ঘর, যারা ঘোড়া ক্রয় বিক্রয় করতো আবার অন্য রাস্তায় বিভিন্ন রঙের সিল্ক এবং অন্যান্য কাপড় বিক্রি হত।

উপরের বর্ণনা থেকে জানা যাচ্ছে বাংলার সুলতানের আমলে লক্ষণাবতি ছিল একটি বড় শহর এবং হুসেন শাহ রাজবংশের সুলতান গিয়াসউদ্দিন মামুদ শাহ অবধি তা বজায় ছিল। এটা বলা যেতেই পারে উত্তরে যেমন দিল্লি একটা মহানগর ছিল সেইরকম গৌড় বাংলার মহানগর ছিল।

৯.৩ সাংস্কৃতিক পরিসর : বাংলায় সুফিবাদের প্রভাব

বাংলায় শহরের বৃদ্ধি এবং সীমিত ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধির ঘটার পেছনে সাংস্কৃতিক কারণ ছিল অভিবাসী মুসলিম বিশেষ করে সুফি সাধকরা মসজিদ, খানকা, দরগা এবং মাদ্রাসা তৈরি করা শুরু করেছিল। সুফি সাধকদের ধর্মস্থান নির্মাণ করার কারণে কিছু নগর কেন্দ্রের উত্থান হয়, যেমন, লক্ষণাবতি, সোনারগাঁ,সাতগাঁও, চাটগাঁ বা চট্টগ্রাম, পান্ডুয়া বা ফিরোজাবাদ।

ইসলামে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানখা (ধর্মশালা)-র গুরুত্ব অপরিসীম। তাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করে বাসিন্দাদের নিবিড় জমায়েত। জামি বা মসজিদ মণ্ডলীর প্রয়োজন অন্তত ৪০ জনের দায়িত্ববান স্থায়ী বাসিন্দার অনুষ্ঠান বৈধ করার জন্য। Tabaqat-i-Nasiri-তে মহম্মদ বখতিয়ার খিলজির প্রশংসা করা

URBAN CENTRES AND MINT TOWNS IN 1539 A.D.

হয়েছে মসজিদ, মাদ্রাসা তৈরি করে দেওয়ার জন্য। এটা প্রমাণিত হয় একটা আরবি ভাষায় অনুবাদিত সংস্কৃত বই-এ (অমৃত কুম্ভ) ১৩শ শতাব্দীর কামরূপ দার্শনিক নাম ভোজের ব্রাহ্মণ-র লেখা থেকে, যিনি লক্ষণাবতিতে মসজিদে শুক্রবারের নামাজের সাক্ষী ছিলেন। তখন আলি মর্দান খিলজি সুলতান ছিলেন। তখনকার শিলালিপি (epigraphically) থেকে প্রতিষ্ঠির হয় যে সামসুদ্দিন ইউশুফ শাহ-র থেকে গিয়াসুউদ্দিন মামুদ শাহ (১৫৩৩-৩৮) মধ্যবর্তী সময়ে লক্ষণাবতিতে ১২টি জামি মসজিদ তৈরি করা হয়েছিল।

সুলতানদের সময়ে সোনারগাঁও একটা গুরুত্বপূর্ণ শহরে কেন্দ্র ছিল। শহর সোনারগাঁও বা সুবর্ণগ্রাম এখনকার বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার নিকট নারায়ণগঞ্জ-এ অবস্থিত। সুলতানি রাজত্বের প্রথম ৫০ বছর সোনারগাঁও-র নাম জানা যায় না, সোনারগাঁও সম্বন্ধে প্রথম জানতে পারা যায় জিয়া-উদ-দিন রাবানির তারিখ-ই-ফিরোজ শাহি থেকে। সেই সময় সোনারগাঁও শাসন করতো একজন হিন্দু রাজা, দনুজ রাই, সম্ভবত তিনি ছিলেন দেব বংশের দামোদর দেবের বংশধর। যারা বিক্রমপুরের সেন রাজবংশের উত্তরসূরি। এখানে যথেষ্ট প্রমাণ আছে আর এটা প্রমাণিত যে রাজা দনুজ রাই সুলতান বলবনের প্রভুত্ব মেনে নিয়েছিলেন এবং রাজস্ব দিতেন বলবন, বলবন পুত্র বুগরা খান এবং লক্ষণাবতির অন্যান্য সুলতানদেব। কিন্তু সোনারগাঁও তখন সুলতানি রাজত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়নি এবং সে তাঁর স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছিল ১৩শ শতকের শেষ অবধি। সামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৩০১-১৬) সোনারগাঁও বিজয় করেন এবং শেষ পর্যন্ত সোনারগাঁও সুলতানি রাজত্বের অংশ হয় ১৩০২ সালে।

এরপর সোনারগাঁও খুব দ্রুত একটি শিক্ষা কেন্দ্র হয়ে ওঠে এবং সুফি সাধকদের বাসস্থান হিসবে গড়ে ওঠে ১৩শ এবং ১৪শ শতাব্দীতে। প্রচুর সংখ্যক সুফি সাধকরা ভিড় করেন ১৩শ শতকের শেষ চতুর্থাংশে সম্ভবত বলবন বাংলা থেকে চলে যাওয়ার পরে। সেইসময় মধ্যযুগের একজন বিখ্যাত সুফি সাধক শেখ আবু তওয়ামা (Tawwama) সোনারগাঁও আসেন এবং এখানেই স্থায়ীভাবে থেকে যান। তিনি সেখানে ছাত্রদের জন্য একটি মাদ্রাসা তৈরি করেন এবং তার শিষ্যদের জন্য একটি আশ্রম তৈরি করেন, তাঁর মৃত্যু অবধি তিনি এগুলো যথাযথভাবে পরিচালনা করেছিলেন ৭০০ হিজরি (১৩০০-১ খ্রি:) (AD ১৩০০-১) তার সঙ্গী ছিলেন বিহারের বিখ্যাত সুফি সাধক হজরত সরাফ-উদ-দিন-ইয়াহ-মানেরি, যিনি সোনারগাঁওতে ২২ বছর ধরে বাস করেছিলেন (৬৬১-৭৮২ হিজরি) এবং তাকসির, হাদিস, বিচারনীতি এবং অন্যান্য ইসলামিক বিভিন্ন শাখার শিক্ষা নিয়েছিলেন শেখ আবু তওয়ামা-র দক্ষ নির্দেশনায়। হৌ হিয়ান ১৪১৫ সালে লিখেছেন সোনারগাঁও-তে বাজার এবং দোকান ভালোভাবে সাজানো ছিল। সোনারগাঁও বহুদিন শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল হুসেন শাহ বংশের শেষ অবধি। এর ফলে সুফি সাধকদের সংস্পর্শে সোনারগাঁও-র জনসংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি পায়।

এটা জানা যায় যে এইসমস্ত মাদ্রাসা এবং ধর্মশালাকে কেন্দ্র করে চারপশে উচ্চ শিক্ষিত মানুষের ঘন বসতি গড়ে উঠেছিল। এর ফলে এই ঘন জনসংখ্যার কারণে সুপরিকল্পিত বাজার এবং ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এই সাংস্কৃতিক পরিবেশে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি মধ্যযুগের বাংলায় নগরায়ণের অন্যতম কারণ।

৯.৪ বাংলার টাঁকশাল নগরী

ব্যবসা বাড়বার সাথে সাথে দরকার হয়ে পড়ল গঠনমূলক মুদ্রা ব্যবস্থা। সুলতানি শাসনের পত্তনের সময় বাংলায় সেরকম কোন প্রতিষ্ঠিত মুদ্রা ব্যবস্থা ছিল না। বাংলায় সুলতানি শাসনের পত্তনের পর তারা গঠনমূলক মুদ্রা ব্যবস্থা শুরু করলে, তাদের ছিল bi-metalic (দ্বিধাতু) অর্থাৎ সোনা ও রূপোর তৈরি মুদ্রা। পরের দিকে তাম্র মুদ্রারও বাজারে ছাড়া হয়। অতএব সুলতান তার রাজত্বের মধ্যে নতুন কোন অংশ যুক্ত করলে তারা বাজারে তাদের মুদ্রার প্রচলন করতো এবং সেখানে একটি নতুন টাঁকশাল তৈরি করতো, যার ফলে ঐ নগরের বিকাশ হত।

লক্ষণাবতি অধিকার করার পর মহম্মদ বখতিয়ার খিলজি সেখানে একটি টাঁকশাল বানান। মুদ্রণ সংক্রান্ত প্রমাণাদি থেকে জানা যায় লক্ষণাবতির টাঁকশাল থেকে গিয়াসুউদ্দিন আজম শাহর (১৩৮৯-১৪১০)-র সময় পর্যন্ত মুদ্রা বাজারে ছাড়া হয়েছে। পাণ্ডুয়া শহরে টাঁকশাল তৈরি হয়েছে ১৩৪২-তে আলউদ্দিন দিন আলম শাহর (১৩৩৮-১৩৪২) আমলে এবং মুদ্রা তৈরি অব্যাহত থাকে রুক-উদ্দিন-বারবাক শাহর (১৪৫৯-১৪৭৪)-র আমল অবধি। ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁও-তে মুদ্রা তৈরি হওয়া শুরু হয় এবং অব্যাহত থাকে সিকান্দর শাহ (১৩৫৮-১৩৮৯)-র সময় অবধি। সাতগাঁও মুদ্রা নগরী হিসাবে পরিচিতি পায় মহম্মদ বিন তুঘলকের সময় ১৩২৯ এবং অব্যাহত থকে ১৪২৮ অবধি। টাঁকশাল শুধু মুদ্রা তৈরি করতো না, নানা সরকারি কাজকর্মের ফলে নগর সবসময় জীবন্ত থাকতো।

এটা ঠিক বাংলার শাসকরা এই সোনার মুদ্রা কখনও কখনও প্রচলন করতো কোন অনুষ্ঠানের স্মারক হিসাবে। তারা ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসারণের জন্য প্রচলন করত তাই নয়, যেমন, বখতিয়ার খিলজি তাঁর গৌড় জয়ের স্মারক হিসাবে এই ধরনের মুদ্রা প্রচলন করেন। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ তার কামরূপ কামতা, জাজনগর ও ওড়িশা জয়ের জন্য সোনার মুদ্রা প্রচলন করেন। এছাড়া সোনার মুদ্রা দিল্লির বাদশাহে সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়ার কারণেও তৈরি হত। এর সবচেয়ে ভাল উদাহরণ হচ্ছে গিয়াসুউদ্দিন এর মুদ্রা। এই ধরনের মুদ্রাগুলি বাণিজ্যিক কাজকর্মে সাধারণত কিছুই ব্যবহার হত না। বাংলার প্রথমদিকের মুসলিম শাসকদের মধ্যে সেরকম কোন ইচ্ছাই ছিল না এই আর্থিক মুদ্রা ব্যবহার করে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারণ ঘটানোর, ব্যবসা বাণিজ্যেই বৃদ্ধি ঘটেছিল প্রধানত নিজের থেকেই, সুলতানদের থেকে সরাসরি কোনো পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই। যদিও উদাহরণ আছে এই স্বর্ণমুদ্রা দিল্লির সুলতানদের উপহার দেওয়া হত এবং অন্য দেশের রাজদূতদেরও এই স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেওয়া হত।

ইলিয়াস শাহি রাজবংশের শেষ দিকে প্রায় ২০টি টাঁকশাল ছিল। এই ২০টি টাঁকশালের মধ্যে ফিজুজাবাদ, সাতগাঁও, ফতেবাদ, মুজ্জামাবাদ এবং চট্টগ্রাম একদম প্রথম থেকেই মুদ্রা উৎপাদন অব্যাহত ছিল, যখন খালিফাবাদ (এখনকার বাংলাদেশের খুলনা জেলার বাগেরহাট), সিতপুর বা শান্তিপুর (নদীয়া জেলা), বারবাকবাদ (এখনকার দিনাজপুর জেলা) এবং মুহম্মাদাবাদ (মোটামুটি এখনকার মুর্শিদাবাদকে চিহ্নিত করা যায়) নতুন প্রতিষ্ঠা হয়।

সুতরাং আমরা বলতে পারি এই ধরনের টাঁকশাল যেখানে তৈরি হত, লোকেরা সেখানে নানা কাজের জন্য আসতে আরম্ভ করতো এবং ধীরে ধীরে বিভিন্ন বসতি গড়ে উঠত এবং ঘন জনসংখ্যার নগর গড়ে উঠতো। এর পরেই এই নতুন নগরগুলোতে সুবিন্যস্ত ব্যবসায়িক কেন্দ্র বা বাজার গড়ে উঠতো মানুষের বিভিন্ন দরকারি জিনিসের। এই পুরো ব্যবস্থাটাই একটির সঙ্গে আরেকটি যুক্ত হয়ে একটি ব্যবসায়িক শহরে কেন্দ্র হয়ে উঠতো। ফলে এই সমস্ত টাঁকশাল যেখানে তৈরি হল সেখানে অনিবার্যভাবেই নগরায়ণ হলো এবং আরেকদিক দিয়ে বলা যায় বাংলার এতগুলি টাঁকশাল নগরী গড়ে ওঠার ফলে অনিবার্যভাবে বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হলো। ফলে মধ্যযুগের বাংলায় মুদ্রা অর্থনীতির কারণে নগরায়ণের দ্বিতীয় পর্ব ঘটে।

৯.৫ ব্যবসা এবং বাণিজ্য

নগরায়ণের বৃদ্ধির শেষ কারণ ব্যবসা ও বাণিজ্যের উন্নতি। নানা বিদেশি ভ্রমণকারী এবং মুদ্রা সংক্রান্ত বিষয় থেকে জানা যায় ১৪শ শতকের প্রথমদিকে বাংলায় ব্যবসা ও বাণিজ্যের একটি নতুন প্রেরণা বা আবেগ এসেছিল। তবাকাত-ই-নসিরি থেকে জানা যায় বখতিয়ার খিলজির সৈন্যদল যারা লক্ষ্ণাবতি আক্রমণ করেছিল তাদের নদীয়ার মানুষরা ঘোড়া ব্যবসায়ী বলে ভুল করেছিল এবং এই সমস্ত ঘোড়াগুলো লক্ষ্ণাবতির তে আসতো কারপাত্তন (হয়তো এখনকার কাঠমান্ডু) গবাদি পশুর হাট থেকে। এই ঘটনা মুসলিমদের বাংলার আগমণের পূর্বে যে স্থলপথে আন্তর্দেশীয় বাণিজ্য হত তাতে আলোকপাত করে।

কিন্তু ১৩শ শতাব্দীতে সুলতানি শাসনের সময় ব্যবসার প্রতি এই আবেগ প্রেরণা ছিল নগণ্য। এটি হয়েছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আদর্শ মুদ্রা ব্যবস্থা না থাকার জন্য। সেইসময় প্রায়ই মুসলিম তুর্কিদের মধ্যে শত্রুতা ও রক্তপাত হত এবং তার ফলে রাজ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হত। কখনও কোথাও কোথাও বিদ্রোহীরা সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতার দাবি জানাত, সেই সময় সুলতান যে মুদ্রা প্রচলন করতেন তার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল সার্বভৌমত্বের চিহ্ন প্রদর্শন করা। ১৪শ শতকের গোড়ায় যখন শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৩০১-১৬) সুলতান তখন ধীরে ধীরে রাজনৈতিক অস্থিরতা কমে স্থিতিশীল হলো, সেই সময় নতুন ভাবে আন্তর্দেশীয় ও বহির্দেশীয় বাণিজ্যের সূচনা হলো। প্রায় সবরকম কৃষিজাত ও অকৃষিজাত দ্রব্যসমূহের বাজারে কেনা বেচা স্থানীয়ভাবে শুরু হলো। কিছু দ্রব্যসমূহের মূল্য এবং কম দামের সম্বন্ধে ইবান বতুতা লিখে গেছেন সেগুলো হলো চাল, চিনি এবং বস্ত্র। তিনি বলেছেন এছাড়া ঘি, গোলাপ জলের এত বেশি মূল্য ছিল যে তা রফতানি হত না, স্থানীয়ভাবেই বিক্রয় হত। লক্ষ্ণাবতি, সোনারগাঁও, পান্ডুয়া এবং সাতগাঁও-তে যে নিয়মিত বাজার বসতো তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলার শিল্পদ্রব্য সম্বন্ধে চৈনিক ভ্রমণকারীদের থেকে জানা যায়, যে প্রায় ১০০ ধরনের কারুকার্যমণ্ডিত শিল্পদ্রব্য সেই সময় বাজারের বিভিন্ন দোকানে পাওয়া যেতো। চৈনিক ভ্রমণকারী হো হিয়ান ১৪১৫-তে বাংলায় এসেছিলেন তার থেকে জানা যায় সোনারগাঁও বাজারে সমস্ত প্রকারের পণ্যের কেনা বেচা হত। তিনি আরও লিখেছেন পান্ডুয়ার বাজারে দোকানগুলি পাশাপাশি অবস্থান করতো। ফলে এই দ্রুত বৃদ্ধি বাণিজ্যিক

কারণে বাংলায় নানা স্থানে বাজার-কেন্দ্রীক নগর গড়ে উঠেছিল। এর ফলে চারপাশে নগরায়ণের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছিল।

কসবা (Qashba) বা ছোট নগর তৈরি হয় শহর এবং গ্রামাঞ্চলের মধ্যেকার যোগসূত্র হিসাবে। এই কসবা শব্দটি নানা মুদ্রা এবং শিলালিপিতে পাওয়া যায়, যেমন কসবা গিয়াসপুর, কসবা ফিরোজবাদ ইত্যাদি। শহরের বাজারগুলি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতো গ্রামাঞ্চলের উদ্বৃত্ত পণ্যের উপর এবং কসবা নিয়ন্ত্রণ করতো গ্রামের পণ্যের শহরের বাজারে যোগানের। এই স্থানীয় ব্যবসায় বাজারে মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার হত কড়ি এবং ছোট ছোট খোল বা খোলা।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এটা নিসংকোচে বলা যায় বাংলার বস্ত্র, বাণিজ্যের মূল কেন্দ্র ছিল এবং সুতি বস্ত্র প্রচুর উৎপাদন হত। বাংলা সেই সময় ব্যবসা ও সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল ইন্দোনেশিয়া এবং মালয় উপমহাদেশের সাথে।

আমির খসরুর বই Ejar-i-Khusrau থেকে জানা যায় যে সমস্ত শহরে বড় বাজার ছিল, সেগুলো সুলতানি আমলে বাণিজ্যিক সমৃদ্ধ ঘটেছিল। আমির খসরুর বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় বাজারে লভ্যতা ও কমদামি নানা পণ্যের ব্যাপারে যেমন, ক্রীতদাস, গবাদি পশু, পোশাক, বই, ফল, প্রার্থনা আসন ইত্যাদি; বাজারে অত্যাধিক ভীড় সম্বন্ধে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ১৫শ শতকে চৈনিক ভ্রমণকারীর থেকে জানতে পারা যায় যে সমস্ত পণ্য সোনারগাঁও এবং পান্ডুয়াতে সংগ্রহ করা হত এবং এখান থেকেই বিতরণ করা হত। গ্রাম থেকে আমদানি করা পণ্য সামগ্রি প্রথমে কাছাকাছি নগরে আনা হত, তারপর সেখান থেকে ব্যবসায়ী এবং পাইকাররা সেগুলো সংগ্রহ করে কাছাকাছি রাজধানী শহরে বা বন্দর শহরে নিয়ে আসতো পুনরায় বিতরণ বা রফতানি করতে বিভিন্ন নগর এবং শহরে।

৯.৬ উপসংহার

উপরের সমগ্র আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত পৌঁছাতে পারি যে, মুসলিম আগমনের আগেও বাংলায় শহর ও নগর ছিল। যদিও সুলতানি আমলে বিশেষ করে ১৪শ শতকের শুরুতে নগরায়ণের একটা নতুন ঢেউ এসেছিল। নানা কারণ, যেমন সুফি সাধকদের আগমন, টাঁকশাল নগরের প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবসা এবং বাণিজ্য বৃদ্ধি এসব কারণও দ্রুত নগরায়ণের কারণ। মধ্যযুগের বাংলায় বিখ্যাত শহর কেন্দ্রগুলি ছিল লক্ষণাবতি, পান্ডুয়া, সোনারগাঁও এবং সাতগাঁও।

৯.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. মধ্যযুগের বাংলায় নগরায়ণের পেছনে প্রধান কারণগুলি কী কী ছিল?

২. বাংলার রাজধানী লক্ষণাবতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখুন।

৩. নগরায়ণের বৃদ্ধির জন্য সুফি সাধকদের কী ভূমিকা ছিল?

৪. মধ্যযুগের বাংলায় ব্যবসা ও বাণিজ্য কীভাবে নগরায়ণ বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল? উদাহরণের সাথে বর্ণনা করুন।

৯.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Alam, Md. Khurshid, *Urbanization under to Sultans of Bengal During* 1203-1538 AD, (Aligarh, Centre of Advaned study, Dept. of History AMU, 2006).

Chandra Satish, *History of Medeival India* (N. Delhi, Orient Blackswan Pvt. Ltd., 2007).

Moreland, WH, *The Agrarian system of Moslem India, A Historical Essay with Appendices* (London : Cambridge University Press, 2010).

Sarkar, Jadunath (ed), *A History of Bengal Muslim Period* (Vol-II) (1200-1757 AD) (N. Delhi, B. R. Publishing Corporation, 2017).

Sengupta, Nitish, *Land of two rivers, A history of Bengal from Mahabharata to Mujib*, (N. Delhi : Penguin Books, 2011).

একক ১০ ❑ মুর্শিদকুলি খানের উত্থান

গঠন

১০.০ উদ্দেশ্য

১০.১ ভূমিকা

১০.২ মুর্শিদকুলির রাজত্বের প্রারম্ভিক কয়েক বছর এবং মুঘল কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার বিবাদ।

১০.৩ মুর্শিদকুলি খানের রাজস্ব সংক্রান্ত প্রশাসন

১০.৪ মুর্শিদকুলির রাজত্বে বাণিজ্যিক অর্থনীতির বৃদ্ধি

১০.৫ উপসংহার

১০.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১০.৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১০.০ উদ্দেশ্য

- বর্তমান আলোচ্য অংশে বাংলার ইতিহাসে মুর্শিদকুলি খানের উত্থান সম্বন্ধে অধ্যয়ন করা হয়েছে।
- দুটো মৌলিক বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে :
  - ☞ মুর্শিদকুলি খানের সঙ্গে মুঘল কেন্দ্রীয় সম্পর্ক।
  - ☞ মুর্শিদকুলি খানের রাজস্ব সংক্রান্ত প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য।
- মুর্শিদকুলি খানের রাজত্বে বাণিজ্যিক, অর্থনীতি বিকাশ নিয়েও এই অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

১০.১ ভূমিকা

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্যের ক্ষমতা হ্রাস পায়, নানা আঞ্চলিক শক্তি মাথা তোলে। সেইরকম একটি আঞ্চলিক রাজ্য হলো বাংলা, যা হয়ে ওঠে একটি আধা স্বাধীন রাজ্য, সরকারি দেওয়ানের অধীনে। এই পরিবর্তনের সময়কালে বাংলার শাসক রূপে উত্থান ঘটে মুর্শিদকুলি খাঁর। যদিও ঐতিহাসিক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত অনুযায়ী বাংলা, অঙ্গ রাজ্যের মতো ছিল যারা কখনই আনুষ্ঠানিকভাবে মুঘল বাদশাহের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করেনি। তারা সবসময় দিল্লির মুঘল বাদশাহকে তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে অধিপতি প্রভু হিসবে মান্যতা দিয়েছে। কিন্তু দৃশ্যের অন্তরালে, বাস্তবে শাসনকার্যে তারা স্বায়ত্ব শাসন পুরোপুরি প্রয়োগ করেছিল।

১০.২ মুর্শিদকুলি রাজত্বের প্রারম্ভিক কয়েক বছর এবং মুঘল কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার বিবাদ

হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের জন্ম, মুর্শিদকুলি খানের আগে নাম ছিল সূর্যনারায়ণ মিশ্র। ১৬৭০ সালে একজন হাজী সূর্যনারায়ণ-র পরিবারের সবাইকে হত্যা করে এবং সূর্যনারায়ণকে ক্রীতদাস হিসাবে ধরে নিয়ে যায় এবং জোর করে ইসলাম ধর্মে ধমান্তরিত করে। নতুন নাম হয় মুর্শিদকুলি খান; পরে তাঁকে মুঘল সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত করা হয়। ঘটনাক্রমে, মুর্শিদকুলি খান ঔরঙ্গজেবের একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি হয়ে ওঠেন, যাকে প্রথমে বাংলার দেওয়ান (রাজস্ব সংগ্রহকারী) নিযুক্ত করা হয়, লাভজনক প্রদেশের বিপুল আয়কে সঠিকভাবে সংগ্রহ করার জন্য। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুর্শিদকুলি খান রাজ্যের সবরকম ব্যাপারেই তার ক্ষমতা প্রয়োগ করা শুরু করলেন। তিনি নামেই শুধু দেওয়ান ছিলেন, কিন্তু কার্যত তিনি আধা স্বায়ত্বশাসিত রাজা হয়ে উঠলেন।

ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারী বাদশাহ বাহাদুর শাহ তখন বিভিন্ন রাজ্যের নানা সমস্যার সমাধান করতে ব্যস্ত ছিলেন, এবং নতুন করে বাংলার দেওয়ানের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়তে চাননি। সত্যি বলতে গেলে, মুর্শিদকুলি তখনও মুঘল কেন্দ্রীয় কোষাগারে রাজস্ব পাঠানো বন্ধ করেননি। এই কারণে বাহাদুর শাহ, মুর্শিদকুলি খানকে পুনরায় ১৭১০ সালে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করেন।

কিন্তু দিল্লীর ভবিষ্যত বাদশাহ (১৭১৩-১৯) ফারুকশিয়ার (Farukshyiar)-এর উত্থানে সাথে সাথে পরিস্থিতির পরিবর্তন শুরু হয়। বাদশাহ জাহান্দার শাহ-র সথে ফারুকশিয়ারের বিরোধ ছিল এবং তিনি আগ্রহী ছিলেন প্রাদেশিক রাজ্যগুলির পুরনো মুঘল অভিজাতদের দূর করে দেওয়া এবং উত্তর ভারতে হারানো ক্ষমতা পুনঃউদ্ধার করা। এছাড়া ব্যক্তিগত স্তরে মুর্শিদকুলির সাথে তার সম্পর্ক কখনই ভালো ছিল না। তাই সিংহাসনে বসার কয়েক মাস আগে, ফারুকশিয়ার তার বিশ্বস্ত সেনাপতি রশিদ খানকে পাঠালেন মুর্শিদকুলিকে সরিয়ে বাংলার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে। কিন্তু রসিদ খান এবং তার সৈন্যবাহিনী মুর্শিদকুলির কাছে পরাজিত হন এবং রসিদ খান নিহত হন, মে, ১৭১২ সালে। ফলে ফারুকশিয়ার কাছে অন্য কোন বিকল্প ছিল না মুর্শিদকুলি খানের আধিপত্য মেনে নেওয়া ছাড়া। মুর্শিদকুলি রাজ্যে আরও মনোনিবেশ করেন। ১৭১৭ সালে তিনি একটি নতুন শহর তৈরি করেন এবং নাম দেন মুকশুদাবাদ (পরে মুর্শিদাবাদ) এবং সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন ঢাকা থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে।

১৭১৭ সালে বাদশাহ ফারুকশিয়ার মুর্শিদকুলি খানকে সরকারিভাবে বাংলা, বিহার, ওড়িশার নিজাম (শাসক) হিসাবে নিযুক্ত করেন। ঐতিহাসিক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন এই অভুতপূর্ব বিশেষ অধিকার অর্থাৎ একইসাথে দুটি পদে অধিষ্ঠান করা, যা বহু বছরের পুরনো মুঘল আইনের অর্থাৎ ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণের পরিপন্থী। মুর্শিদকুলি দেওয়ান ও নিজাম দুই পদেই অধিষ্ঠান করে বাংলার একনায়ক হয়ে ওঠেন। দ্রুত, এই দুটি পদ অর্থাৎ দেওয়ান ও নিজামকে একত্রিত করে একটি নতুন পদ নবাব মুর্শিদকুলি খান ও তার উত্তরাধিকারীদের জন্য তৈরি করা হলো।

Murshid Quli Khan

যাহোক, এটা বলা হয় মুর্শিদকুলি খান কখনই মুঘল কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সমস্ত নিয়ম মেনে চলতেন না। কিন্তু তবুও তিনি মুঘল বশ্যতার অধীনতা মেনেই এবং প্রদেশের রাজস্ব-র একটা অংশ নিয়মিত মুঘল কোষাগারে পাঠাতেন (যদিও সেটা পরিমাণে খুবই কম রাজস্ব আদায়ের নিরিখে), যদিও বাংলার রাজস্বের সেই অল্প অর্থই ছিল মুঘল কোষাগারের নিয়মিত উপার্জন, সেই সময়কার বিপর্যস্ত মুঘল বাদশাহের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সময়ে। কিন্তু এই সামান্য মুঘল সখ্যতার আড়ালে মুর্শিদকুলি পুরো স্বায়ত্ব শাসন উপভোগ করতেন এবং বাংলায় প্রায় স্বাধীন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও মুর্শিদকুলি খান ছিলেন মুঘল বাদশাহের দ্বারা নিযুক্ত বাংলার শেষ সুবেদার।

১০.৩ মুর্শিদকুলি খানের রাজস্ব সংক্রান্ত প্রশাসন

মুর্শিদকুলি খানের ক্ষমতার প্রধান স্তম্ভ ছিল রাজস্ব সংক্রান্ত প্রশাসন। ১৮ শতকের সেই অশান্ত সময়েও বাংলা ছিল উদ্বৃত্ত রাজস্ব উৎপাদন প্রদেশ। বাংলা উর্বর ব-দ্বীপ অঞ্চল, প্রায় সমস্ত রাজস্বই আসত প্রদেশের কৃষিকার্য থেকে। মুর্শিদকুলি খান পর্যাপ্ত রাজস্ব আদায়ের জন্য কাজে লাগান মধ্যবর্তী শক্তিশালী জমিদারদের। জমিদাররা তাদের নিজ নিজ এলাকায় কৃষকদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে যথাযথ কৃষিকার্য সংগঠিত করে নবাবের জন্য রাজস্ব সংগ্রহ করার দায়িত্বে থাকতো। এই জমিদার-পদ্ধতির সাহায্যে বাংলার ভূমি ও রাজস্ব প্রায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পায় ১৭০০-২২ সালের মধ্যে। মুর্শিদকুলি খান অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারির থেকে অল্পসংখ্যক বড় জমিদারির বিকাশকে তরান্বিত করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। কিছু প্রকৃতপক্ষে ১৭২৭ সালে তার মৃত্যুর সময়ে বাংলা ৬০ শতাংশ কৃষিজমি মাত্র ১৫ জন

শক্তিশালী জমিদারদের হাতে ছিল। যদিও এই দৃশ্যমান সমৃদ্ধির পেছন অন্ধকারময় দিকও ছিল। রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদার ও মুর্শিদকুলি খানের প্রশাসন প্রজাদের উপর ভীষণ অত্যাচার করতো। ঐতিহাসিক ক্লার্ক (Clarke) বলেছেন মুর্শিদকুলি এবং তার সুবিধাভোগীরা সম্পদ বাড়াবার জন্য গরিব প্রজাদের উপর নানা অত্যাচার চালাতো। তারা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজস্ব জমা দিতে বাধ্য থাকতো, কোন অজুহাতই চলতো না সে দুর্ভিক্ষ হলেও। এছাড়া চাষিদের বেত্রাঘাত, তাদের জমি কেড়ে নিয়ে পুরো পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হত। এর ফলে অনেক জায়গায় কৃষকরা তাদের বাড়িঘর জমি ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে যেতো নবাব এবং জমিদারের লোকেদের ভয়ে।

১০.৪ মুর্শিদকুলির রাজত্বে বাণিজ্যিক অর্থনীতির বৃদ্ধি

কৃষি অর্থনীতি ছাড়াও বাংলায় মুর্শিদকুলি খানের সময় শিল্প ও বাণিজ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় ব্যবসায়িক মহলে। ঐ সময় বাংলায় সুতি এবং সিল্কের কাপড়, তেল এবং চিনি উৎপাদন হত এবং এই সমস্ত জিনিসের প্রচুর চাহিদা থাকতো পারস্য, আফগানিস্তানের এবং পূর্ব এশিয়াতে। আঠারো শতকে স্থল বাণিজ্য নানা রকম অসুবিধা সম্মুখীন হত রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য। তাই, রপ্তানি বাণিজ্য আন্তঃসামুদ্রিক বাণিজ্যের এক নতুন রাস্তায় শুরু হলো। ইউরোপ হয়ে উঠেছিল বাংলার নানা সামগ্রীর এক লাভজনক বাজার এবং নানা ইউরোপিয়ান দেশ বাংলায় তাদের বাণিজ্যিক কুঠি খুললো আমদানি রফতানি বাণিজ্যের সুবিধার জন্য। অন্যান্য ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও এগিয়ে এলো এই আন্তঃসামুদ্রিক বাণিজ্যে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ক্ষমতাশালী হিন্দু ব্যবসায়ী যেমন উমিচাঁদ, বা আর্মেনিয়াম খাজা ওয়াজিদ। মুর্শিদকুলি খানের সময় প্রায় ২.৩ কোটি টাকার পণ্য বাংলা থেকে রফতানি হয়। শুধু কাশিমবাজার কুঠিতে ৭০ লাখ টাকার সিল্ক জাতীয় পণ্য উৎপাদন হয়। প্রায় সমান মূল্যের পণ্য মুর্শিদাবাদ কাস্টমস্ অফিসে রেকর্ড করা হয়। ফলস্বরূপ এই ধরনের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে শহরগুলি যেমন, ঢাকা, কলকাতা, কাশিমবাজার আকারে ও জনসংখ্যায় বৃদ্ধি পায়।

আবার অন্যদিকে, এই বিপুল পরিমাণ অর্থের লেনদেনের ফলে আবশ্যিক হয়ে পড়লো আর্থিক এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে জগৎ শেঠ পরিবারের, যিনি ছিলেন মুর্শিদকুলি খানের একজন নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্ক মালিক বা মহাজন, যিনি ঘটনাক্রমে ১৭৩০ সালে প্রদেশের কোষাগারের প্রধান হয়ে ওঠেন। আবার কখনও কখনও ঠিক সময়ে রাজস্ব জমা দেওয়ার জন্য জমিদারদের উপর মুর্শিদকুলি খান প্রশাসনের চাপ দেওয়ার ফলে, জমিদাররা এই ব্যাঙ্ক মালিক বা মহাজনদের থেকে অর্থ ধার করতে বাধ্য হতেন। সুতরাং নানা লেনদেন, বিনিময় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় গড়ে ওঠে। এই ব্যাঙ্কগুলি শুধু বেসরকারি খাতে অর্থ সাহায্য করতো না, জরুরি অবস্থায় প্রদেশ প্রশাসনকেও অর্থনৈতিক সাহায্য করতো অর্থ ধার দেওয়ার মাধ্যমে। জানা যায় মারাঠা লুঠপাটের সময় এই ব্যাঙ্ক মালিকরা/মহাজনরা যেমন জগৎ শেঠ নবাবি প্রশাসনকে নিজেদের ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও সাময়িক আর্থিক সাহায্য করেছিল, রাজ্য অর্থনীতি ঠিক রাখার জন্য।

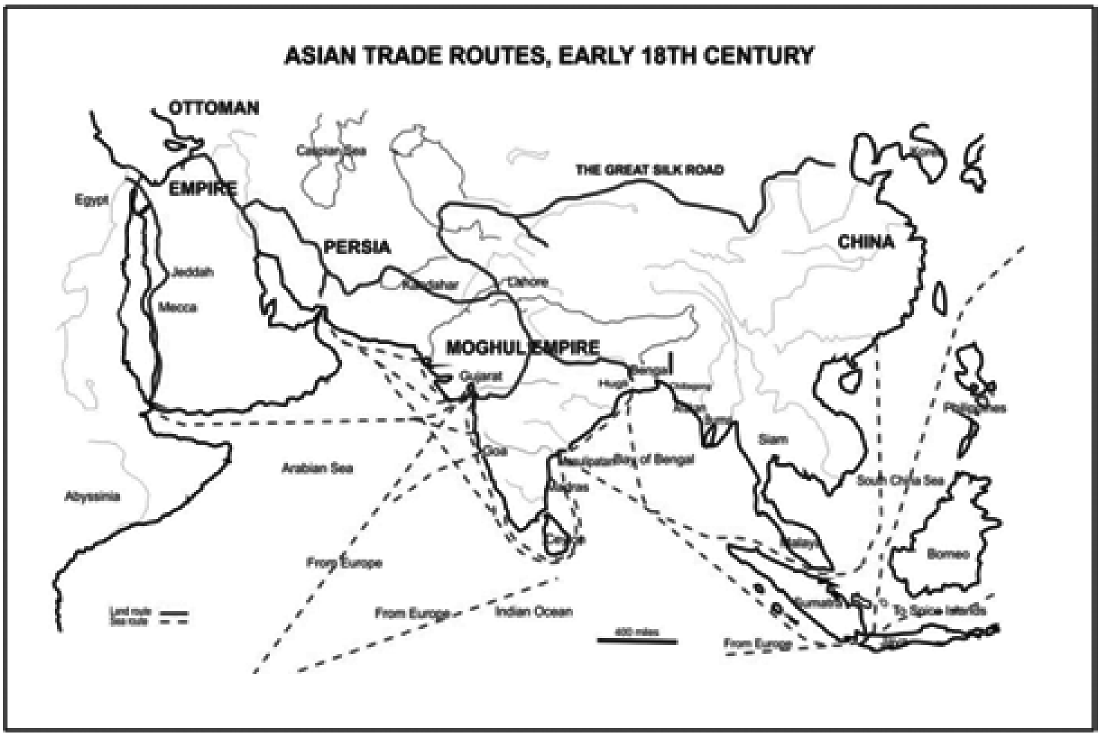

যদিও, বাংলায় শিল্প ও বাণিজ্যে খুব লাভজনক ভবিষ্যত ছিল, কিন্তু মুর্শিদকুলি খান প্রশাসন সবসময় ব্যবসা-বাণিজ্যের উপযোগী নীতি গ্রহণ করতে পারেনি যাতে বাংলায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশ ঘটে। নবাব কখনও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ তৈরি করেননি ঠিকমতো নৌবাহিনী তৈরি করার, যারা ভারতীয় নৌব্যবসায়ীদের জলদস্যু ও ইউরোপিয়ান হস্তক্ষেপ থেকে বাচাঁবে। নবাব কখনও সঠিক বিনিয়োগ করেননি যাতে ভারতীয় শিল্পের বৃদ্ধি ও উন্নতি হয়, এরই ফলস্বরূপ ইউরোপিয়ান ব্যবসায়ীরা বেসরকারিভাবে তাদের ভারতীয় সহযোগিদের থেকে এগিয়ে যায়, অদূর ভবিষ্যতে বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ ইউরোপিয়ানদের হাতেই যায়।

১০.৫ উপসংহার

এই আলোচ্য অংশে এটি স্পষ্ট যে যদিও মুর্শিদকুলি খান কখনও মুঘলদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করেননি, তা সত্ত্বেও তিনি বাংলায় প্রায় স্বায়ত্বশাসন উপভোগ করতেন। তাঁর সময়ে বাংলায় বেসরকারি এবং কৃষি খাতে রাজস্ব আদায়ের প্রচুর সমৃদ্ধি লাভ করেছিল, যার একটি প্রধান কারণ ছিল সফল রাজস্ব সংক্রান্ত প্রশাসন। তার সাথে জমিদারি ব্যবস্থার উন্নতি, যদিও এই একপেশে সমৃদ্ধির পশ্চাতে অন্ধকার দিকও ছিল।

১০.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. সংক্ষেপে মুর্শিদকুলি খানের উত্থান সম্বন্ধে লিখুন।

২. মুর্শিদকুলি খান কি একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন? এই প্রসঙ্গে মুর্শিদকুলির সাথে মুঘল প্রশাসন সম্পর্কের টানাপোড়েন বিস্তারিতভাবে লিখুন?

৩. মুর্শিদকুলি খানের কৃষি রাজস্ব সংক্রান্ত প্রশাসন সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখুন?

৪. মুর্শিদকুলি খাঁর রাজত্বকালে বাংলার বাণিজ্যিক চিত্র কেমন ছিল?

১০.৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Bandyapadhyay, Sekhar, *from Pabassey to Partition* : *A history of Modern India*, (N.Delhi, Orient Blackswan Pvt. Ltd. 2004).

Sarkar, Jadunath (ed), *A History of Bengal Muslim Period* (Vol-II) (1200-1757 AD) (N. Delhi, B. R. Publishing Corporation, 2017).

Sengupta, Nitish, *Land of two rivers, A history of Bengal from Mahabharata to Mujib*, (N. Delhi : Penguin Books, 2011).

একক ১১ ❑ আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে নবাবি বাংলার উত্থান

গঠন

১১.০ উদ্দেশ্য
১১.১ ভূমিকা
১১.২ সুজাউদ্দিন মহম্মদ খান (১৭২৭-৩৯)
১১.৩ আলামুদ্দাওয়ালা হায়দার জং বা সরফরাজ খান (১৭৩৯-৪০)
১১.৪ আলিবর্দি খান (১৭৪০-৫৬)
১১.৫ মারাঠা আক্রমণ (১৭৪২-৫১)
১১.৬ ইংরেজ বণিকদের সাথে সম্পর্ক
১১.৭ উপসংহার
১১.৮ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী
১১.৯ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১১.০ উদ্দেশ্য

- আলোচ্য অংশে অধ্যয়ন করা হয়েছে আঞ্চলিক ভিত্তিক রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উত্থান, অষ্টাদশ শতকের বাংলায় নবাবি শাসন।
- সুজাউদ্দিন মহম্মদ খান, সরফরাজ খান ও আলিবর্দি খানের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে।
- বাংলার ইতিহাসে দুটো বিভিন্ন দিক এখানে বলা হয়েছে।
  - ☞ বাংলায় নিরন্তর মারাঠা আক্রমণ
  - ☞ ইংরেজ বণিকদের সাথে বাংলার সম্পর্ক

১১.১ ভূমিকা

সুবে বাংলা ছিল মুঘল বাদশাহের সবচেয়ে ধনী সুবা বা রাজ্য। পঞ্চদশ শতকে আকবর বাংলা জয় করার পর একাধিকপদ তৈরি হয় মুঘল শাসন ব্যবস্থার অধীনে। নিজামত (Governorship) এবং দিওয়ানি (Premiership) ছিল মুঘল শাসন ব্যবস্থার দুটি প্রধান শাখা। সুবেদার ছিলেন নিজামতের ভারপ্রাপ্ত এবং তার অধীনস্থ বিভিন্ন আধিকারিক দেওয়ান (Primeminister)-সহ, যার দায়িত্ব ছিল রাজস্ব সংগ্রহ এবং আইন। মুঘল সাম্রাজ্যের আঞ্চলিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে একাধিক আধা-স্বাধীন

শক্তির উত্থান ঘটে। ১৭১৭ সালে মুঘল বাদশা ফারুকশিয়ার বাংলার পুরানো সুবেদার/শাসক পদ্ধতি বন্ধ করে বংশগত নবাব পদ চালু করেন। মুর্শিদকুলি খান যিনি প্রথমে প্রধানমন্ত্রী দায়িত্বে ছিলেন, তিনি হলেন বাংলায় প্রথম নবাব। নবাব মুঘল বাদশাহের নামে মুদ্রা প্রচলন করার অধিকারী হলেন। কিন্তু সমস্ত ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে নবাব বাংলা শাসন করতেন স্বাধীন রাজার মতো।

১১.২ সুজাউদ্দিন মহম্মদ খান (১৭২৭-৩৩)

মুর্শিদকুলি খানের কোন বংশধর ছিল না। সুতরাং তিনি তার কন্যার পুত্র সরফরাজকে সিংহাসনে বসার জন্য নির্বাচন করেছিলেন। ১৭২৭ সালে মুর্শিদকুলির মৃত্যুর পর মুর্শিদকুলি খানের জামাই সুজাউদ্দিন তার নিজের ছেলেকে অপসারিত করে নিজেই সিংহাসন অধিকার করে নবাব হন।

সুজাউদ্দিন অভিজ্ঞ শাসক ছিলেন না, সুতরাং তিনি প্রধান উপদেষ্টাদের একটি দল তৈরি করলেন, উপদেষ্টাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম উভয়ই ছিল যারা গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্যে নবাবকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবে। এই দলে ছিলেন রায় রায়ান আলমচাঁদ একজন সম্ভ্রান্ত আর্থিক বিনিয়োগকারী, জগত শেঠ একজন বিখ্যাত ব্যাঙ্কার, যিনি কিছুদিনের মধ্যে কোষাগারের দায়িত্ব পান এবং দুজন মুসলিম কর্মচারী, আলিবর্দি খান এবং তার ভাই হাজি আহমেদ। এর ফলে তার শাসন ব্যবস্থার সময় ব্যবসায়ী, ব্যাংকার, জমিদাররা শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং স্থানীয় শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ঐতিহাসিক Philip Calkins-র মতে বাংলার সরকারকে অনেকটা প্রভাবশালী শক্তির সহযোগিতার সরকারের মতো মনে হয়।

১৭৩৩ সালে মুঘল বাদশাহ মহম্মদ শাহ রঙ্গিলার ফরমান অনুযায়ী বিহার, বাংলা সুবার অন্তর্ভুক্ত হয়। এর ফলে সুজাউদ্দিন প্রকৃতপক্ষে শাসক হলেন একটি বিশাল প্রদেশের যা বাংলা বিহার ও ওড়িশার মিলিত যোগফল। পূর্ববর্তী শাসকদের মতো সুজাউদ্দিনও মুঘল কেন্দ্রীয় শাসকদের আদেশ এবং আইন মেনে চলতেন না এবং মাঝে মাঝে মুঘল কোষাগারে রাজস্ব পাঠাতেন ।

১১.৩ আলামুদ্দওয়ালা হায়দার জং বা সরফরাজ খান (১৭৩৯-৪০)

সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তার পুত্র সরফরাজ খান শান্তিপূর্ণভাবে সিংহাসনে বসেন এবং আলেম-উদ-দৌওলা হায়দার জং উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু উচ্চ শব্দের শিরোনাম উপাধি সত্ত্বেও তিনি ছিলেন একজন দুর্বল শাসক এবং শাসনকার্যে তার কোন মনই ছিল না। বেশিরভাগ সময়েই তাঁর হারেমে ও মদের নেশায় কাটতো। এতে তিনি নবাবি অভিজাত ও জমিদারদের মধ্যে অপ্রিয় হয়ে ওঠেন। এরই ফলস্বরূপ ১৭৪০ সালের এপ্রিল মাসে একটি সামরিক বিদ্রোহ সংঘটিত হয় সেনাপতি আলিবর্দি খানের নেতৃত্বে এবং তাকে সমর্থন করেন জগৎ শেঠ সহ অভিজাত ও জমিদাররা। সৈন্যবাহিনী নবাবকে পদচ্যুত এবং হত্যা করে এবং আলিবর্দি খান সিংহাসনে বসেন। সরফরাজ খানের মৃত্যুর সাথে সাথে মুর্শিদকুলি খানের বংশের সমাপ্তি হয়।

১১.৪ আলিবর্দি খান (১৭৪০-৫৬)

১৬৭৬ দাক্ষিণাত্যের কোনো শহরে আলিবর্দি খান জন্মগ্রহণ করেন, তার নাম ছিল মির্জা মহম্মদ মাদানি, তিনি ছিলেন হয় বিদেশি আরব নয় তুর্কি-আফগান উপজাতি খোরশান বংশোদ্ভুত।

১৭০৪ সালে আলিবর্দি খানের সংসারে দারিদ্রতা নেমে আসে। তাঁরা ওড়িয্যাতে আসেন। পরে সহ শাসক সুজা-উদ-দিনের অধীনে চাকরি পান। সুজা-উদ-দিন, মহম্মদ আলিকে রাজমহলের ফৌজদার পদে উন্নত করেন এবং আলিবর্দি খান হিসাবে অভিহিত করেন। ১৭৩৩ সালে আলিবর্দিকে বিহারের ডেপুটি নাজিম (Dy. Subahdar) করা হয়। এক বছর বাদে নবাব সুজাউদ্দিন তাঁকে সুজা-উল-মালিক (Hero of the country) শিরোনামে পাঁচ হাজারি মনসবদায় (rank holder of 5000) করেন এবং অজিমবাদে ফিরে আসেন।

Jagath Seth and Nawab Shujauddin

আলিবর্দি ছিলেন খুব উচ্চাকাঙ্খী। ১০ই এপ্রিল ১৭৪০ সালে গিরিয়ার যুদ্ধে (Battle of Giria) তিনি সুজাউদ্দিনের বংশধর নবাব সরফরাজ খানকে পরাস্ত ও হত্যা করেন। এর পর তিনি বাংলা এবং বিহারের ক্ষমতা অধিকার করেন। আলিবর্দি খান এবং তাঁর পরিবার ছিল অবশ্যই বিদেশি এবং তাঁর মাতৃভাষা এবং দরবারি ভাষা দুটোই ছিল ফার্সি।

ঐতিহাসিক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন আলিবর্দি খানের রাজত্বই আনুষ্ঠানিকভাবে মুঘলদের সাথে সম্পর্কে ছেদ পড়েছিল। সমস্ত প্রধান নিয়োগগুলো মুঘল কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে করা বন্ধ হলো এবং

মাঝে মাঝে মুঘল কোষাগারে যে রাজস্ব পাঠানো হত তাও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। আলিবর্দি কখনও তাঁর পদের জন্য মুঘল বাদশাহের সম্মতিপত্রের জন্য চেষ্টা করেননি।

১১.৫ মারাঠা আক্রমণ (১৭৪২-৫১)

যুদ্ধে জিতে সিংহাসনে বসার কয়েক মাসের মধ্যেই আলিবর্দির বিরুদ্ধে ওড়িশার নায়েব নাজিম, সুজাউদ্দিনের জামাই রুস্তম জং বিদ্রোহ করলেন। আলিবর্দি ফলওয়ারির (এখনকার বালেশ্বরের কাছে) যুদ্ধে (১৭৪১) তাকে পরাস্ত করে নিজের ভাইপোকে ওড়িশার নাজিব নাজিম পদে স্থলাভিষিক্ত করে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন।

Alivardi Khan

কিন্তু হতাশ রুস্তম জং নাগপুরের মারাঠা শাসক রঘুজি ভোঁসলের মারাঠা সেনার সাহায্যে আবার ওড়িশা অধিকার করেন। আলিবর্দি পুনরায় ওড়িশা আক্রমণ করেন এবং আবার রুস্তম জংকে পরাস্ত করেন (ডিসেম্বর ১৭৪১)। কিন্তু এবার বাংলার সম্পদ মারাঠাদের আবিষ্কার করার ফলে এবং অতি সহজে বিদ্যুৎ গতিতে হানা দিয়ে লুঠ করা সহজ বলে, এরপর থেকে বার বার মারাঠারা বাংলায় হানা দিয়ে লুঠতরাজ করা আরম্ভ করলো।

যদিও এটা বলা হয় যে মারাঠারা বাংলার গ্রামগুলে লুঠতরাজ চালাত কিন্তু তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল শাসক জমিদার এবং মুসলিম অভিজাতদের ধনসম্পদের উপর। এদিকে জমিদারদের মজুত করা ধনসম্পদ লুঠ হয়ে যাওয়ার ফলে জমিদাররা কৃষকদের জোর করে বাধ্য করতো এই ক্ষতি পূরণের জন্য আরও বেশি

করে কর দিতে। এমনকি আলিবর্দি খান ওড়িশা থেকে মুর্শিদাবাদ ফিরে আসার আগেই রঘুজি ভোঁসলে ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে একটি মারাঠা সৈন্যবাহিনী, বাংলায় পাঠান। এরা পাঞ্চতের দিক দিয়ে বর্ধমান ঢোকে এবং গ্রামাঞ্চলে লুঠতরাজ শুরু করে। রুস্তম জংয়ের ধূর্ত নায়েব মির হাবিব মারাঠাদের সাথে মিলিত হন এবং তিনি বাংলার গ্রামাঞ্চল সম্বন্ধে দরকারি খবর এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত পরামর্শ মারাঠাদের নিয়মিত দিতেন।

প্রায় দশ বছর ধরে এই মারাঠা বর্গি (মারাঠা ঘোড়সওয়ার)-দের অত্যাচার ও লুণ্ঠনে বাংলায় বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় হাহাকার পড়ে যায়। প্রতি বছর মারাঠা ঘোড়াসওয়াররা আসতো এবং পশ্চিমে হুগলি নদীর থেকে উত্তরে রাজমহল এবং দক্ষিণে মেদিনীপুর জলেশ্বর অবধি এই বিশাল এলাকায় লুঠতরাজ করতো। অন্ততঃ দুবার (১৭৪২ এবং ১৭৪৭) এই ঘোড়াসওয়ার মারাঠা লুঠেরার দল মুর্শিদাবাদ অবধি পৌঁছে যায় এবং রাজধানী শহর লুণ্ঠন করে এবং বিখ্যাত ব্যবসায়ী জগতশেঠের প্রাসাদও এদের হাতে লুণ্ঠিত হয়। আগে বাংলা সাক্ষী থেকেছে বহু রাজনৈতিক সংঘর্ষের কিন্তু এই প্রথমবার সমাজের ক্ষমতাবান জমিদার শ্রেণি এবং মুসলিম অভিজাতদের দল ভয় পেল, যারা ছিল প্রকৃতপক্ষে বাংলার ধনশালী গোষ্ঠী যাদের ক্ষমতার মূল উৎস ছিল সঞ্চিত ধনসম্পদ। কিন্তু এখন তাদের এই সম্পদ বিপদের মুখে এসে পড়ে।

কিছু কিছু লিখিত বর্ণনা থেকে বর্গি হানাদারির সম্বন্ধে জানা যায়, তাদের দ্রুততার সঙ্গে 'আঘাত ও পালিয়ে' যাওয়া কৌশলের সাথে নবাবের সৈন্যদল যুঝে উঠতে পারতো না, এই ধরনের গেরিলা যুদ্ধের সাথে তাদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। আলিবর্দির সৈন্যবাহিনী এত দ্রুত পৌঁছাতে পারতো না এবং মারাঠা ঘোড়াসওয়াররা বাতাসের বেগে যেকোনো দিকে দ্রুত ধাবমান হতে পারতো। নবাব সৈন্যর অনুপস্থিতে মারাঠারা রাঢ় বাংলার সমৃদ্ধ নগর এবং গ্রামগুলো আনন্দের সাথে লুণ্ঠন করতো। এ ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু লুঠতরাজ, দখল নয়। তারা প্রায়ই নবাবের বাহিনী এসে পৌঁছানোর আগেই কর্পূরের মতো উড়ে যেতো। শুধু গঙ্গা-ভাগীরথী নদীই কার্যকরি বাধা হিসাবে এই মারাঠা হানাদার (বর্গি)-দের গতিরোধ করতে পেরেছিল। পূর্ব দিকে তারা কয়েকবার মাত্রই পেরোতে পেরেছিল। মারাঠা আক্রমণের ভয়ে ইংরেজরা কলকাতায় মারাঠা ডিচ নামে একটি খাল কাটান, এটা উত্তর কলকাতার একমাত্র রাস্তা যেখান দিয়ে স্থলপথে আক্রমণ করা যেতে পারতো। প্রথম অবস্থায় আলিবর্দি খান এই মারাঠা হানাদারিকে খুব বিশেষ গুরুত্ব দেননি। এমনকি ওড়িশা বিজয়ের পর তিনি সৈন্যবাহিনীকে সামরিকভাবে ছুটি দিয়েছিলেন। যখন আলিবর্দি বুঝতে পারলেন আক্রমণের মাত্রা তখন উনি একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। যেহেতু সৈন্যরা যখন মারাঠাদের আক্রমণ করতো তখন তারা সাময়িকভাবে পালিয়ে যেতো এবং যখনই সৈন্যবাহিনী সজাগ থাকতো না তখন তারা আক্রমণ করে পালিয়ে যেতো। মির হাবিরের পরামর্শ মতো ভাস্কর পণ্ডিত একদম মুর্শিদাবাদ অবধি পৌঁছে গিয়েছিল। আলিবর্দি তার বিশাল সৈন্যদল নিয়ে দ্রুত বেগে এগিয়ে আসতে মারাঠারা মুর্শিদাবাদ ছেড়ে চলে যায় কিন্তু এর আগে তারা শহর লুণ্ঠন চালায় এমনকি জগত শেঠের বাড়ি থেকেও লাখ টাকা নগদ লুঠ করে নিয়ে যায়। এই সময়ের মধ্যেই উত্তরে মালদা থেকে দক্ষিণে মেদিনীপুর, বালেশ্বর অবধি বিশাল এলাকা মারাঠাদের কব্জায় চলে যায়, শুধু মুর্শিদাবাদ এবং হুগলি নদীর পূর্ব দিকের অঞ্চলে নবাবি শাসনের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

মারাঠারা মনে করত মুঘল সম্রাট মারাঠা, রাজা শাহুকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার চৌথ (অর্থাৎ মোট রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ) আদায়ের অধিকার দিয়েছেন। এই আইনি অধিকারের বলে রঘুজি ভোঁসলে, শাহুর প্রতিনিধি রূপে, এই অঞ্চল থেকে চৌথ আদায়ের অধিকারী। বর্গি আক্রমণের সম্বন্ধে সমসাময়িক উৎসগুলো থেকে বিশদে জানা যায়। গঙ্গারাম নামে একজন লেখকের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' থেকে মারাঠা আক্রমণ সম্বন্ধে জানা যায়। আবার অন্য মতে বলা হয় রাজা শাহু পুনাতে একদিন ঘুমের মধ্যে ঠাকুর ভবানি (মা দুর্গা)-কে দেখেন এবং তিনি রাজাকে নির্দেশ দেন বাংলায় বাঙালি হিন্দুদের মুসলিম দুর্বৃত্ত

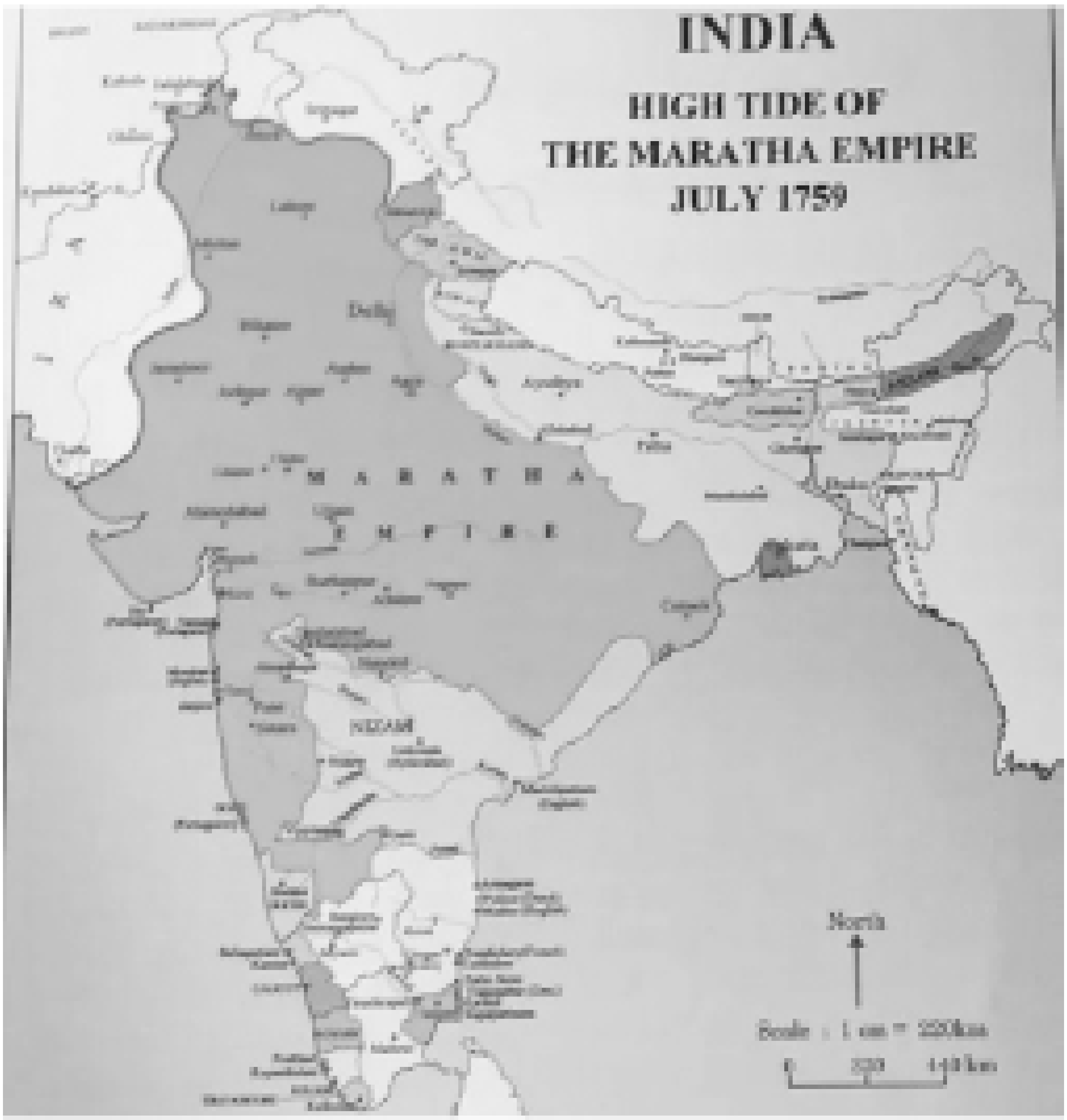

Maratha Empire

আলিবর্দির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য। এরপরেই রাজা শাহু, রাঘুজি ভোঁসলেকে নির্দেশ দেন বাংলা আক্রমণ করার, যদিও মারাঠা আক্রমণে বাঙালি হিন্দু এবং মুসলিম উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হত।

শেষ পর্যন্ত ১৭৫১ সালে আলিবর্দি খাঁ মারাঠাদের প্রধান সেনাপতি পেশোয়া বালাজি বাজি রাও বা নানাসাহেব-এর সাথে একটা সম্পর্ক স্থাপন করেন। প্রসঙ্গত পেশোয়ার সাথে রাঘুজি ভোঁসলের সম্পর্ক ভাল ছিল না। পুনার পেশোয়া তার একজন সেনাপতি বালা রাও পণ্ডিতকে পাঠান রঘুজি ভোঁসলে, ভাস্কর পণ্ডিতকে শাস্তি দিতে। বালা রাও মুর্শিদাবাদে নবাব আলিবর্দির সাথে সাক্ষাৎ করেন। নবাব তাকে যথারীতি হাতি, মণিমুক্তা উপহার দেন এবং রাঘুজি ভোঁসলের বিরুদ্ধে একটি আনুষ্ঠানিক জোট তৈরি হয়। একটি সম্মলিত বাহিনী রাঘুজি ভোঁসলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয় এবং রাঘুজি ভোঁসলেকে পরাস্ত এবং বহিস্কার করেন এবং বাংলায় ভাস্কর পণ্ডিতকেও পরাস্ত ও বহিস্কার করেন। বালা রাও দাক্ষিণাত্যে ফিরে যান এবং নবাব মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন।

Peshwa Balaji Baji Rao

এখন আলিবর্দি খানের আসল কাজ হলো পেশোয়াকে দেওয়ার জন্য অর্থ যোগাড় করা এবং এই অর্থ দেওয়ার শর্তে মারাঠারা বাংলায় লুঠতরাজ বন্ধ রাখবে। আলিবর্দি খানের কোষাগারে আর কোন অর্থ ছিল না মারাঠাদের দেবার জন্য এবং মারাঠারা আবার তাদের পুরোনো খেলা অর্থাৎ লুঠতরাজ শুরু করে। শেষ পর্যন্ত ১৭৫১ সালের মে মাসে আলিবর্দির সাথে মারাঠা (রাঘোজি এবং পেশোয়া দুজনেই সই করেছিল)-দের মধ্যে একটা শান্তি চুক্তি স্থাপিত হলো। এই চুক্তির শর্তাবলী নিম্নলিখিত—

১. সুবর্ণরেখা নদীর সীমানা অবধি এলাকা মারাঠা দখলে থাকবে এবং মারাঠা সৈন্য সুবর্ণরেখা নদী কখনও পেরোবে না।

২. মির হাবিবকে ওড়িশার নায়েব নাজিম করা হয়, প্রধানত তিনি বাধ্য থাকবেন আলিবর্দি খানকে কর দিতে কিন্তু বাড়তি কর মারাঠাদের দিতে হবে সৈন্যবাহিনীর খরচের জন্য।

৩. নবাব প্রতি বছর ১২ লাখ টাকা চৌথ বা কর মারাঠাদের দেবে বাংলার কর হিসাবে।

এই চুক্তির একবছর বাদে মারাঠারা মির হাবিবকে হত্যা করে এবং ওড়িশাকে মারাঠা সাম্রাজ্যের রাজ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে।

এই মারাঠা আক্রমণে বাংলার অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। কৃষিক্ষেত্র, বৈদেশিক বাণিজ্য, দেশীয় শিল্প ইত্যাদি সমস্ত দিকগুলোকেই প্রভাবিত করে। এই মারাঠা অগ্রাসনের জন্য ইউরোপীয়রা তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে, বিশেষ করে কলকাতায় ও চন্দননগরে। আলিবর্দি প্রবলভাবে এর বিরোধিতা করেছিলেন। এই মারাঠা আক্রমণে প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক উভয়ই ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং যা আলিবর্দিকে শেষ দিন অবধি বিমর্ষ রেখেছিল। শেষ পর্যন্ত ১৭৫৬ সালে তার মৃত্যু হয়।

১১.৬ ইংরেজ বণিকদের সাথে সম্পর্ক

ইংরেজরা বাংলা প্রদেশে প্রথম বসতি স্থাপন করে সেই ১৬৩৩ সালে যখন তারা একটা ছোট কুঠি তৈরি করে হরিহরপুরে মহানদী নদীর মুখে। সময়ের সাথে সাথে এক এক করে ইংরেজরা আরও তিনটে কুঠি স্থাপন করে কাশিমবাজার, হুগলি আর বালেশ্বরে। শেষে ১৬৯০ সালে জব চার্ণক Calcutta বা কলকাতায় কোম্পানির মূল কেন্দ্র স্থাপন করেন। পূর্বদিকে সুতানটি গ্রাম, (বর্তমান শোভাবাজার বাগবাজার), গোবিন্দপুর ও কালিকাতা নিয়ে। সেই সময় থেকে কলকাতা ইংরেজ বণিকদের কাছে ছিল পূর্বাঞ্চলীয় সদর দপ্তর।

আমরা আগে আলোচনা করেছি যে বাংলার উৎপাদিত পণ্য যেমন সুতির কাপড় এবং সিল্কের কাপড়ের বিদেশি বাজার যথা ইউরোপ এবং মধ্য এশিয়াতে প্রচণ্ড চাহিদা ছিল। রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য উত্তর ভারতে স্থলপথে বাণিজ্য হ্রাস পেয়েছিল, এই অবস্থায় বাংলায় ইউরোপিয়ান বণিকরা দ্রুত সামুদ্রিক বাণিজ্যে জোর দেয় এবং তাদের প্রচুর মুনাফা বৃদ্ধি পায়। ইংরেজ বণিকদের এই হঠাৎ সমৃদ্ধি লাভ করাতে মুর্শিদকুলি খান বিরক্ত হলেন এবং ১৭১৩ সালে ইংরেজ বণিকদের উপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করে তাদের নির্দেশ দিলেন ভারতীয় বণিকদের মতো সমান হারে বাণিজ্য শুল্ক দিতে।

ইংরেজরা এই নির্দেশে ক্ষুব্ধ হয়ে ধূর্ততার সঙ্গে কৌশল করে জন সারমেনের নেতৃত্বে একটি ইংরেজ দলকে দিল্লির তৎকালীন মুঘল বাদশাহ ফারুকশিয়ারের কাছে দরবার করতে পাঠায়, ইংরেজ প্রতিনিধি দল জানতো যে তাদের এই কৌশলগত আলোচনার দ্বারা তারা মুঘল সম্রাটের মন জয়ে করবে। সেইমতো ১৭১৭ সালে বিখ্যাত ফারুকশিয়ার ফরমান জারি হয়। এই ফরমান অনুযায়ী ইংরেজরা বাংলায় বিনা করে ব্যবসা করতে পারবে এবং এছাড়া কলকাতার আশেপাশে ৩৮টি গ্রামকে ইংরেজদের ইজারাও দেওয়া হয়।

তখন বাংলা মুঘল শাসনের অধীনে ছিল এবং মুর্শিদকুলি খান মুঘল রাজদরবারের সাথে বিবাদ করতে রাজি ছিলেন না। সুতরাং তত্ত্বগতভাবে বাদশাহ ফরমান বাংলা প্রদেশে প্রযোজ্য হলো। কিন্তু এটি

জানা যায় মুর্শিদকুলি রাজ্যের অনেক ব্যাপারে স্বায়ত্বশাসন ভোগ করতেন, সুতরাং তিনি ইংরেজদের বাণিজ্য শুল্ক মুকুব মেনে নিলেও ৩৮টি গ্রামের লিজ মেনে নিলেন না এবং ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়াম তৈরি করতে বাধা দিলেন।

এই স্থিতাবস্থা পরবর্তী নবাবদের সময়েও বহাল রইলো। ইংরেজরা মাঝে মাঝে নবাবদের সতর্কতামূলক অর্থ প্রদান করতো যাতে তাদের বিনা বাধায় তাদের ব্যবসায়িক কাজকর্ম চালাতে পারে। আলিবর্দি খান এই ব্যাপারে ভালভাবেই ওয়াকিবহাল ছিলেন যে ইংরেজ এবং ফরাসিরা পরস্পরের বিরুদ্ধাকারী রাজনৈতিক শক্তি এবং তারা বাংলাতেও পরস্পরের বিরোধিতা করতো। তিনি ইউরোপিয়ানদের মৌচাকের মৌমাছির সাথে তুলনা করতেন। যার মুধু খুবই লাভজনক, কিন্তু তুমি যদি তার মৌচাককে বিরক্ত কর, তাহলে তারা তোমায় হুল ফুটিয়ে মেরে দেবে। মারাঠা আক্রমণের ফলে বাংলার স্থিতাবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। নবাব যখন মারাঠাদের দমন করতে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সুযোগে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এই একই সময়কালে ইউরোপীয়দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমুদ্র-বাণিজ্য বাংলার অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে।

১১.৭ উপসংহার

সুতরাং অষ্টাদশ শতকের বাংলা ছিল নবাবি শাসিত, যদিও নবাবদের উত্থান এবং এই স্থিতাবস্থা একটানা ছিল না। একদিকে আমরা দেখি নবাব মুর্শিদকুলি খানের নবাব রাজবংশ শেষ হয়ে, তুর্কি ফারসি আলিবর্দি খানের বংশের হাতে নবাবির পরিবর্তন অন্যদিকে মারাঠা হানাদারির ভয়াবহতা এবং ইউরোপীয়দের উত্থান।

১১.৮ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. নবাব সুজাউদ্দিন এবং সরফরাজ খানের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখুন।

২. এটা কেন বলা হয় যে আলিবর্দি খানের রাজত্বের সময়েই মুঘল প্রশাসনের সাথে পাকাপাকিভাবে বিচ্ছেদ ঘটে?

৩. কেন এবং কী কী কারণে বাংলায় মারাঠা আক্রমণ হয়?

৪. মারাঠা আক্রমণের ভয়াবহতা সংক্ষেপে লিখুন। কেন আলিবর্দি খানের বারবার চেষ্টা স্বত্বেও বাংলায় মারাঠা আক্রমণ ঠেকানো যায়নি?

৫. মারাঠা আক্রমণ কী করে শেষ হলো? এই সূত্রে বাংলা ও মারাঠাদের মধ্যে চুক্তির শর্তাবলীগুলি লিখুন।

৬. বাংলার নবাবদের সাথে ইংরেজ বণিকদের প্রাথমিক সম্পর্ক কীরকম ছিল? সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

১১.৯ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Bandyapadhyay, Sekhar, *from Pabassey to Partition : A history of Modern India*, (N.Delhi, Orient Blackswan Pvt. Ltd. 2004).

Sarkar, Jadunath (ed), *A History of Bengal Muslim Period* (Vol-II) (1200-1757 AD) (N. Delhi, B. R. Publishing Corporation, 2017).

Sengupta, Nitish, *Land of two rivers, A History of Bengal from Mahabharata to Mujib*, (N. Delhi : Penguin Books, 2011).

একক ১২ ❑ সিরাজদৌল্লার অধীনে বাংলা

গঠন

১২.০ উদ্দেশ্য
১২.১ ভূমিকা
১২.২ প্রাথমিক সমস্যা এবং পারিবারিক বিবাদ
১২.৩ ব্রিটিশদের সঙ্গে প্রাথমিক দ্বন্দ্ব এবং কলকাতা আক্রমণ
১২.৪ অন্তিম ষড়যন্ত্র এবং সিরাজের পরিণতি
১২.৫ সিরাজদৌল্লার চরিত্র এবং বিভিন্ন দিক
১২.৬ উপসংহার
১২.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী
১২.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১২.০ উদ্দেশ্য

- আলোচ্য অংশে সিরাজদৌল্লার সময়কার বাংলার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
- আলোচ্য অংশে বোঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে সিরাজের সমস্যাসমূহ।
- ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে সিরাজের সম্পর্ক বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।
- এই অংশে সিরাজদৌল্লার চরিত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১২.১ ভূমিকা

মির্জা মহম্মদ সিরাজ-উদ-দৌল্লা (২ জুলাই, ১৭৩৩-১৭৫৭) ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। তাঁর রাজত্বের শেষ চিহ্নিত হয় বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের সূচনা এবং পরে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রায় সব অংশে। সিরাজের বাবা ছিলেন বিহারের শাসক জৈনউদ্দিন এবং মা আমিনা বেগম ছিলেন নবাব আলিবর্দি খানের কনিষ্ঠা কন্যা। যেহেতু আলিবর্দির কোনো সন্তান ছিল না, তাই নাতি সিরাজ তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ ছিল এবং তাঁর খুব ছোটবেলা থেকেই সবাই জানতো আলিবর্দির পর মুর্শিদাবাদে মসনদে বসবে। সুতরাং তিনি রাজপ্রাসাদেই বড় হয়ে ওঠেন যেখানে তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ভবিষ্যতের নবাব হওয়ার জন্য। আলিবর্দি খান ১৭৫২ সালে সরকারিভাবে ঘোষণা করেন যে তাঁর পরে সিংহাসনে রাজকুমার সিরাজই স্থলাভিষিক্ত হবেন, রাজদরবারে এবং পরিবারে প্রথম থেকেই যাতে কোনো ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না থাকে।

১২.২ প্রাথমিক সমস্যা এবং পারিবারিক বিবাদ

১৭৫০ সালে সিরাজ দাদু আলিবর্দি খানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং পাটনা অবরোধ করেন, কিন্তু অতি দ্রুত আত্মসমর্পণ করেন এবং তাকে আলিবর্দি খান ক্ষমাও করে দেন। শেষে আলিবর্দি সিরাজের ভুল মেনে নিয়ে, সিরাজকে তার উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনিত করেন। কিন্তু সিরাজের মনোনয়নে এখানে পরিবারে অন্যান্য সদস্যদর মনোমত না হওয়াতে পরিবারে নানা বিবাদ শুরু হয়। তার রাজ্যাভিষেকে দুজন বিরোধী সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে—একজন খুড়তোত ভাই সৌকত জং এবং দ্বিতীয়জন ঘসেটি বেগম (আলিবর্দির বড় মেয়ে ও সিরাজের সৎমা)। যদিও এইসব বিরোধিতা সত্বেও শেষ পর্যন্ত সিরাজ সিংহাসনে বসেন, ১৭৫৬ সালের ৯ এপ্রিল ৮০ বছর বয়সে আলিবর্দি খানের মৃত্যুর পর।

ঘসেটি বেগমের প্রচুর ধনসম্পত্তি ছিল, সেটাই ছিল তার শক্তির উৎস। ঘসেটি বেগমের থেকে গুরুতর বিরোধিতার আশঙ্কা করে সিরাজউদদৌল্লা তার সম্পত্তি মতিঝিল প্রাসাদ থেকে দখল করেন এবং তাকে গৃহবন্দি করেন। নবাব তার মন্ত্রিসভাতেও নানা পরিবর্তন করেন এবং নিজের পছন্দের লোক বসান। মীরমদনকে সৈন্যবাহিনীতে বকসি (বাহিনীর পে মাস্টার) হিসাবে নিয়োগ করা হয়, বৃদ্ধ মীরজাফরের জায়গায় মোহনলালকে নিয়ে আসা হয় দেওয়ানখানার পেশকার হিসাবে এবং শাসন ব্যবস্থার উপর তাঁর প্রভাব ছিল। এই হঠাৎ পরিবর্তনে মুর্শিদাবাদের পুরোনো প্রভাবশালীরা যারপরনাই ক্ষুব্ধ হন। এদিকে সিরাজ পূর্ণিয়ার গর্ভনর সৌকত জংকে প্রচুর চাপে রাখেন এবং পরে তাঁকে হত্যা করেন। এই ঘটনাগুলির জন্য অনেকেই নবীন নবাবের স্বৈরাচারী মনোভাবের প্রকাশ বলে মনে করেন।

১২.৩ ব্রিটিশদের সঙ্গে প্রাথমিক দ্বন্দ্ব এবং কলকাতা আক্রমণ

সিরাজ তার মাতামহের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী হিসাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন ব্রিটিশদের আগ্রাসী মনোভাবের এবং তাই তিনি বাংলায় ব্রিটিশদের রাজনৈতিক-সামরিক উপস্থিতি যা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এখানে পত্তন করতে চাইছিল তার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত রুষ্ট ছিলেন তার মন্ত্রিসভার কিছু সদস্যের সাথে কোম্পানির বেআইনি যোগাযোগ রেখে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য। কোম্পানির বিরুদ্ধে সিরাজ তিনটি অভিযোগ আনলেন।

প্রথমত, কোনো রকম অনুমতি না নিয়ে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ তৈরি এবং মুজবত করা; দ্বিতীয়ত, মুঘল শাসকদের দেওয়া বাণিজ্যে সুবিধার চরমভাবে অপব্যবহার করায় নবাবের প্রচুর পরিমাণে বাণিজ্য শুল্ক লোকসান হচ্ছিল এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য। তৃতীয়ত, কোম্পানি সিরাজের কিছু কর্মচারীকে অন্যায়ভাবে আশ্রয় দিত, যেমন রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে, যে সরকারি কোষাগার অর্থ নয়ছয় করে ঢাকা থেকে পালিয়েছিলেন।

এদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে যখন সামরিক শক্তি আরও বৃদ্ধি করার কাজ করছিল তখন সিরাজ তাদের সেটা বন্ধ করার আদেশ দেন। কোম্পানি সিরাজের এই আদেশ না শুনে কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। সিরাজ প্রতিশোধ নেন আলিনগরের যুদ্ধে কলকাতা অধিকার করে (কিছু

Nawab Shiraj ud-Dwalla

দিনের জন্য কলকাতার নাম সিরাজ তার দাদুর নামে আলিনগর রাখেন) জুন ১৭৫৬ সালে। নবাব সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করে ফোর্ট উইলিয়াম ও অধিকার করেন। বন্দিদের জেলে স্থান হয় যেটা সামরিকভাবে একজন সেনানায়কের অধীনে রাখা হয়। বন্দিদের সেখানে রেখে একটা ভুলবোঝাবুঝির ফলে সেনানায়ক তার সৈন্য নিয়ে চলে যান এবং বন্দিদের বেশিরভাগই খাদ্য ও জলের অভাবে মৃত্যু হয়। এই ঘটনাকে "ব্ল্যাক হোল ট্রাজেডি (Blackhole Tragedy) বলা হয়। সত্যিকথা বলতে কি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মিথ্যে প্রচার করেছিল এই ব্ল্যাক হোল ট্রাজেডি বা মৃত্যু, যাতে সাধারণের কাছে নবাব সিরাজউদদৌল্লর ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। রবার্ট ক্লাইভের সময় Sir William Meredith নেতৃত্বে একটি অনুসন্ধান কমিটি তৈরি হয়, তিনিও সিরাজ-উদ-দৌল্লার সময় সংগঠিত ব্ল্যাকহোল ট্রাজেডিকে খণ্ডন করেন।

১২.৪ অন্তিম ষড়যন্ত্র এবং সিরাজের পরিণতি

ইতিমধ্যে ১৭৫৭ সালের প্রথম দিকে ব্রিটিশরা চন্দননগরে ফরাসি কলোনি আক্রমণ করে। চন্দননগরে আক্রমণের খবরে নবাব প্রচণ্ড রেগে যান, তাঁর ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে পূর্বের ঘৃণা ফিরে আসে। কিন্তু তিনি এখন বুঝতে পেরেছিলেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে আগে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। নবাব তখন উত্তর দিকে থেকে আফগান শাসক আহমেদ শাহ দুরানির আক্রমণের আশংকা করছেন আর পশ্চিম দিক থেকে মারাঠা আক্রমণের আশঙ্কা। সুতরাং তিনি তার পুরো সৈন্যবাহিনী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে পাঠাতে পারছিলেন না, উত্তর ও পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণের আশঙ্কায়, ব্রিটিশ এবং নবাবের মধ্যে

একটা গভীর অবিশ্বাস তৈরি হয়েছিল। ফলে, সিরাজ গোপনে কাশিমবাজারে ফরাসি কুঠি প্রধান জ্যাঁ ল সঙ্গে শলা পরামর্শ শুরু করেন। নবাব নিজে রায়দুর্লভের অধীনে সেনার একটা বড় অংশ নিয়ে পালাশির দিকে অগ্রসর হন।

নিজের রাজদরবারে নবাবের বিরুদ্ধে আসন্তোষ ছিল। সিরাজের শাসনকালে শেঠ এবং বাংলার দেশি বণিকের দল তাদের সম্পদ রক্ষা করার ব্যাপারে চিন্তিত থাকতো কিন্তু আলিবর্দির শাসনকালে তারা এই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতো। বণিকের দল সবাই মিলে ইয়ার লতিফ খানকে তদের নেতা নিযুক্ত করলেন। উইলিয়াম ওয়াট নবাবের দরবারে ব্রিটিশদের প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁর সাথে বণিকের দল গোপনে যোগাযোগ করে, উইলিয়াম ওয়াট, লর্ড ক্লাইভকে রাজদরবারে সিরাজকে সরানোর ষড়যন্ত্রের খবর দেন। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে মীরজাফর (প্রাক্তন বক্সী), রায়দুর্লভ, ইয়ার লতিফ খান এবং উমিচাঁদ বা আমিরচাঁদ, একজন শিখ ব্যবসায়ী এবং একাধিক সামরিক কর্মচারী ছিলেন। সমস্ত ঘটনা ১লা মে কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিলেক্ট কমিটিতে আলোচনা হয়। একটি চুক্তি হয় মীরজাফর এবং ব্রিটিশদের মধ্যে নবাবকে সরিয়ে তাঁকে সিংহাসনে বসানো হবে, বিনিময়ে তাঁকে তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে ব্রিটিশদের সমর্থন করতে হবে এবং কলকাতা আক্রমণ করার ক্ষতিপূরণ হিসাবে একটি বিশাল অর্থ মীরজাফর ইংরেজ কোম্পানিকে দেবে। ২রা মে-তে ক্লাইভ তার অর্দ্ধেক সৈন্য চন্দননগরের রেখে বাকি অর্দ্ধেককে কলকাতায় পাঠান।

মীরজাফর ও বাকি শেঠেরা চেয়েছিল ব্রিটিশদের সাথে তাদের যে চুক্তি হয়েছে সেটা উমিচাঁদের থেকে গোপন রাখতে। কিন্তু উমিচাঁদ যখন এই চুক্তির কথা জানতে পারলো, তখন তিনি নবাবের থেকে এই চুক্তি গোপন রাখার শর্ত হিসাবে ৩ লাখ টাকা দাবি করলেন। ক্লাইভের কানে যখন এই ঘটনার কথা পৌঁছালো উনি চতুরতার আশ্রয় নিয়ে দুধরনের চুক্তিপত্র তৈরি করলেন একটিতে সব সদস্য সই করলেন অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের সঙ্গে, আরেকটিতে সবাই সই করলো কিন্তু ওয়াটসন সই করলেন না। এই চুক্তিপত্র দুটি মীরজাফর ৪ঠা জুন সই করলেন। অবশেষে দুই পক্ষ পলাশির যুদ্ধে পরস্পরের মুখোমুখি হলেন, সিরাজ পরাজিত হলেন এবং পরে গ্রেফতার হলেন। পলাশির যুদ্ধে, সিরাজের ব্রিটিশদের থেকে বড় সৈন্যবাহিনী ছিল। কিন্তু যুদ্ধের সময় মীরজাফরের অধীনে বেশিরভাগ সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে অংশ না নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্রিটিশদের থেকে দক্ষ সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী থাকা সত্ত্বেও সিরাজের সৈন্যরা পরাজিত হলো। বিশ্বাসঘাতকতার গুরুতর উস্কানি সত্বেও সিরাজের দুজন অন্যতম বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরমদন এবং দেওয়ান মোহনলাল সিরাজের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেন এবং মৃত্যু বরণ করেন। এটা বলা হয় মীরমদনের মৃত্যুর পর মোহনলাল চেয়েছিলেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জারি রাখতে এবং নবাবকে বলেছিলেন পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত নবাবের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে। কিন্তু সিরাজ ইতিমধ্যেই মীরজাফরের ইচ্ছাকৃত ভুল পরামর্শে রাজি হয়ে ছিলেন পশ্চাদপসরণের এবং মোহনলালের সুপরামর্শে তিনি রাজি হলেন না। ২রা জুলাই ১৭৫৭ সালে মীরজাফরের পুত্র মীর মিরনের আদেশে মহম্মদ আলি বেগের হাতে নেমক হারাম দেওড়িতে নিহত হলেন, সিরাজ-উদ-দৌল্লার এই নৃশংস হত্যাও ব্রিটিশ ইস্ট কোম্পানির সাথে মীরজাফরের চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুর্শিদাবাদের খোশবাগে সিরাজের কবর, খুবই সাধারণভাবে সুরুচিপূর্ণ একতলা সমাধি স্থল এবং চারপাশে ফুলের বাগান।

১২.৫ সিরাজ-উদ-দৌল্লার চরিত্র ও বিভিন্ন দিক

যদিও সিরাজকে আধুনিক ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইংরেজদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যোদ্ধা হিসাবে দেখা হয়, কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক মতে তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর এবং তার ব্রিটিশদের বিরুদ্ধতা কোন দেশপ্রেম উৎসাহে নয় বরং তাঁর ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করার জন্যই। তাঁর চরিত্রটি ইতিবাচক না নেতিবাচক, সেটা নির্ভর করে কে বা কারা তাঁর সম্বন্ধে জানাচ্ছে। একদিকে যেমন ভারতীয় লেখকরা এটা দাবি করছেন না, যে তিনি যথেষ্ট দক্ষশাসক বা অতি সদাশয় নবাব, তবে তিনি পুরোপুরি দুর্নীতিগ্রস্তও ছিলেন এটাও বলছেন না, অথচ ইংরেজ লেখকরা সমসাময়িক ইতিহাস সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে সিরাজকে দুর্নীতিগ্রস্ত, স্বৈরশাসক এবং নিষ্ঠুর বলে বর্ণনা করেছেন। যদিও ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের মতে সিরাজের নৈতিক চরিত্রই সবচেয়ে বড় কারণ ছিল, তাঁকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করার জন্য। কিশোর অবস্থাতেই তিনি বেপরোয়া জীবন কাটাতেন, যেটা তার মাতামহের গোচরে এসেছিল, যদিও দাদুর মৃত্যুশয্যায় তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে নবাব হওয়ার পর তিনি জুয়াখেলা আর মদ খাওয়া পুরোপুরি ছেড়ে দেবেন। সেই সময়কার অনেক সূত্র থেকে জানা যায় যে তরুণ নবাব ছিলেন একজন অযোগ্য খামখেয়ালি নবাব। যেমন, রাজদরবারের দক্ষ পুরনো সভাসদদের সরিয়ে নিজের অনুগতদের সেই স্থানে নিয়ে আসা। এই পরিবর্তনটা খুব সাবধানে পদ্ধতিগতভাবে করা উচিত, কিন্তু সিরাজ হঠাৎ করে এই পরিবর্তন করতেন। আবার, পুরোনো দক্ষ সভাসদ বা মন্ত্রিকে পরিবর্তন করে যে বিশ্বস্ত লোককে আনা হলো তার এখনও সদিচ্ছা আছে কিনা ভবিষ্যতে তাঁর আনুগত্য বজায় থাকবে কিনা সেসব নিয়ে চিন্তা করতেন না। উদাহরণ স্বরূপ, যেমন মীরজাফর বা জগত শেঠ এরা নগর দরবরে বহু পুরনো সভাসদ এবং প্রথমে নতুন নবাবের সাথে তাদের কোনো শত্রুতা ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করে আকস্মিক সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের ক্ষমতা হ্রাস করতে তাঁরা ভীত হয়ে পড়ে এবং তরুণ নবাবের উপর রেগে যান।

আবার জনপ্রিয় আখ্যান হলো, সিরাজকে বলা হয় ''বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব''। কিন্তু আক্ষরিক অর্থে সিরাজ না ছিলেন বাঙালি বা একজন স্বাধীন নবাব। প্রথমত : কোন অবস্থাতেই বাংলা তাঁর মাতৃভাষা ছিল না বরং তার মাতৃভাষা ছিল ফরাসি এবং সরকারি কাজে এই ফরাসিভাষাই ব্যবহার হত। এছাড়া তিনি ছিলেন একজন তুর্কি আফগান পরিবারের বংশধর। আবার নবাবি শাসনাধীন বাংলা তখনও দিল্লির মুঘল বাদশাহির অন্তর্গত একটি সামন্ত প্রদেশ ছিল। অনেক পুরনো মুঘল আইন কানুন তখনও বাংলায় জারী ছিল এবং নবাবকে রাজ্যের নানা বিষয়ে রাজদরবারের সভাসদরা পরামর্শ দিত।

১২.৬ উপসংহার

সিরাজের নৈতিক চরিত্র বা অদক্ষতা সবকিছু মেনে নিয়েও এটা বলা যায় ব্রিটিশরা বাংলার বৈধ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং তাঁকে অপসারিত করেছিল, কিন্তু সিরাজ কখনও মুঘল সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করেন নি (সরকারিভাবে বাংলা তখনও দুর্বল মুঘল বাদশাহ সাম্রাজ্যের একটি অংশ)। বাংলায় বহু সাহিত্যে সিরাজকে কিন্তু দুর্বল স্বৈরাচারী শাসক হিসাবে বর্ণনা করার থেকে তাঁকে শহীদ হিসাবে

দেখানো হয়েছে. এটা প্রমাণ করতে চেষ্টা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাকতার জন্য তিনি ক্লাইভকে পরাস্ত করতে পারেননি। যদিও ব্রিটিশরা যথেষ্ট দক্ষ এবং আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র সজ্জিত ছিল, তবুও বাংলার পুরো সৈন্যবাহিনী যদি ক্লাইভের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো, তাহলে পলাশির যুদ্ধের ফলাফল অন্যরকম হতে পারতো।

১২.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. সিংহাসনে আরোহণ করার পর সিরাজকে প্রাথমিক কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিলেন? এবং তিনি কীভাবে তা পরাস্ত করেছিলেন?

২. আলিনগরের যুদ্ধের (১৭৫৬) পটভূমি সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৩. পলাশির যুদ্ধ কীভাবে শুরু হলো? এই প্রসঙ্গে সিরাজের পতন বর্ণনা করুন।

৪. আপনি কি মনে করেন সিরাজ-উদ-দৌল্লার সাহসিকতায় গল্প একতরফা? আপনার নিজস্ব বিশ্লেষণ দিন।

১২.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Bandyapadhyay, Sekhar, *from Pabassey to Partition : A history of Modern India*, (N.Delhi, Orient Blackswan Pvt. Ltd. 2004).

Sarkar, Jadunath (ed), *A History of Bengal Muslim Period* (Vol-II) (1200-1757 AD) (N. Delhi, B. R. Publishing Corporation, 2017).

Sengupta, Nitish, *Land of two rivers, A history of Bengal from Mahabharata to Mujib*, (N. Delhi : Penguin Books, 2011).

একক-১৩ ❑ পলাশির যুদ্ধ (১৭৫৭) : প্রভাব

গঠন

১৩.০ উদ্দেশ্য

১৩.১ ভূমিকা

১৩.২ পটভূমি

১৩.৩ যুদ্ধ

১৩.৪ উপসংহার : ফলাফল এবং প্রভাব

১৩.৫ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১৩.৬ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১৩.০ উদ্দেশ্য

- আলোচ্য অংশে বিশদে পলাশির যুদ্ধ পড়ানো হয়েছে
- এই বিষয়ে পড়ানো হয়েছে তিনটে স্বতন্ত্র কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ঘটনা আলোচনার মাধ্যমে।
    - ☞ যুদ্ধের পটভূমিকা : এখানে আমরা পলাশির যুদ্ধের পেছনে কারণগুলি নিয়ে আলোচনা করবো।
    - ☞ ছাত্রদের এই যুদ্ধ সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত জানাতে বলা হচ্ছে : এর গতিপথ এবং পরিণতি।
    - ☞ আলোচ্য অংশে আরও জানানো হয়েছে যুদ্ধের ফলাফল (পরিণাম) এবং তার প্রভাব।

১৩.১ ভূমিকা

আধুনিক ভারতের ইতিহাসে পলাশির যুদ্ধ একটি প্রধান ঘটনা। সেখান থেকে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা ধরা হয়। এই যুদ্ধ হয়েছিল ক্লাইভের নেতৃত্বাধীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে বাংলার নবাবের (সিরাজ-উদ-দৌল্লার), এই যুদ্ধকে বলা যেতে পারে ভারতে ব্রিটিশ রাজের সূচনার নিষ্পত্তিমূলক ঘটনা। এই যুদ্ধ হয়েছিল অস্তমিত মুঘল সাম্রাজ্যের সময় (Latter Mughal Period)। পলাশির যুদ্ধের সময় দিল্লির মুঘল বাদশাহ ছিলেন দ্বিতীয় আলমগির। কিছু কিছু ঐতিহাসিক ভারতে ব্রিটিশ রাজ কবে শুরু হয়েছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে পলাশির যুদ্ধের কথা বলেন। পলাশির যুদ্ধ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে একটি নির্ণায়ক জয়, যেখানে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে কোম্পানির সেনা ২৩এ জুন ১৭৫৭ সালে

বাংলার নবাবের অনেক বেশি সংখ্যক সেনাকে পরাজিত করতে সমর্থ হয়। এটি ছিল দক্ষিণ এশিয়ায় ব্রিটিশদের প্রথম বিজয়। যুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা দখল করে। এর পরের ১০০ বছরে তারা ভারতীয় উপমহাদেশে প্রায় পুরোটাই দখল করে।

পলাশির যুদ্ধ হুগলি নদীর পাড়ে হয়েছিল, কলকাতার পূর্বে ১৫০ কিমি (৯৩ মাইল) দূরে, তখনকার রাজধানী মুর্শিদাবাদের দক্ষিণে (পলাশি এখনকার পঃবঙ্গের নদিয়া জেলায়)। নবাবের সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন মীরজাফর, যাকে রর্বাট ক্লাইভ বাংলার নবাব করার প্রতিশ্রুতি দেন। ক্লাইভ ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে সিরাজকে পরাস্ত করেন এবং এর ফলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার উপর কোম্পানির আধিপত্য স্থাপনের পথ খুলে যায়।

১৩.২ পটভূমি

এপ্রিল ১৭৫৬ সালে আলিবর্দি খান মারা যান এবং তার উত্তরাধিকারী দৌহিত্র ২৩ বছরের সিরাজ-উদ-দৌল্লা সিংহাসনে বসেন। বলা হয় সিরাজের চরিত্র, হিংস্র মেজাজ ও দুর্বল চরিত্রের মিশ্রণ। ভারতে ইউরোপিয়ান কোম্পানিদের বাণিজ্যে প্রচুর লাভ করাকে তিনি বিশেষভাবে সন্দেহ করতেন। যখন ব্রিটিশ এবং ফরাসিরা তাদের দুর্গকে আরও উন্নত করতে চাইছিল তাদের নিজেদের মধ্যে পরবর্তী যুদ্ধের জন্য, সিরাজ আদেশ দিলেন অবিলম্বে তাদের এই কাজ যা বিনা অনুমতিতে শুরু হয়েছিল বন্ধ করার। ব্রিটিশরা তাদের কাজ বন্ধ করতে অস্বীকার করলে, নবাব ৩০০০ সৈন্য নিয়ে দুর্গ এবং কাশিমবাজারের কুঠি অবরোধ করলেন এবং অনেক ব্রিটিশ কর্মচারীকে বন্দি করলেন। কলকাতার প্রতিরোধ ছিল খুবই দুর্বল এবং নগণ্য। গ্যারিসনে ছিল ১৮০ জন সৈন্য, ৫০ জন ইউরোপিয়ান স্বেচ্ছাসেবী, ৬০ জন ইউরোপিয়ান মিলিশিয়া, ১৫০ জন আর্মেনিয়ান এবং পর্তুগিজ মিলিশিয়া, ৩৫ জন ইউরোপিয়ান গোলন্দাজ এবং জাহাজের ৪০ জন স্বেচ্ছাসেবী। এদিকে নবাবের বাহিনীতে ছিল ৫০ হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদল, ১৬ই জুন সিরাজের বাহিনী শহর অধিকার করে এবং ইংরেজরা ২০ জুন আত্মসমর্পণ করে সংক্ষিপ্ত অবরোধের পর। নবাবের বাহিনী শহর কলকাতা এবং অন্যান্য ব্রিটিশ কুঠিগুলিতে লুণ্ঠন চালায়।

যখন মাদ্রাজ রেসিডেন্সিতে ১৬ই আগস্ট ১৭৫৬ সালে কলকাতার পতনের খবর পৌঁছালো সঙ্গে সঙ্গে কাউন্সিল কর্নেল ক্লাইভ ও অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের নেতৃত্বে একটি সৈন্যবাহিনীকে পাঠালো। এই অভিযানে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে শুধু বাংলায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশ পুনরুত্থান নয়, সাথে কোম্পানির যে আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল তারও ক্ষতিপূরণ আদায় করা। ফোর্ট সেন্ট জর্জ এর কাউন্সিল থেকে একটি চিঠিতে ক্লাইভ ও ওয়াটসনকে বলা হয়েছিল, "the object of the expedition was not merely to re-establish the British settlements in Bengal, but also to obtain ample recognition of the Company's privileges and reparation for its losses." কিন্তু এই কাজ করতে বলা হয়েছিল যুদ্ধ না করে। ক্লাইভ স্থলবাহিনীর নেতৃত্ব ছিলেন, সৈন্যবাহিনীতে ৯০০ জন ইউরোপিয়ান এবং ১৫০০ সিপাই ছিল; অন্যদিকে ওয়াটসন নৌবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন। জাহাজ হুগলি নদীতে প্রবেশ করলো ডিসেম্বর মাসে, এরপর তাঁরা কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার পলাতক ইউরোপিয়ান ও সৈন্যদলের

সাথে মিলিত হলেন ফলতায় ১৫ই ডিসেম্বর। ২৯এ ডিসেম্বর তারা বজবজ দুর্গ থেকে শত্রুদের হটিয়ে দখল নিলো। ২রা জানুয়ারি ১৭৫৭ সালে ক্লাইভ এবং ওয়াটসন কলকাতার দিকে অগ্রসর হলেন। দুর্গের ৫০০ জনের সুরক্ষাবাহিনী সামান্য প্রতিরোধের পর ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পণ করল। কলকাতা অধিকার করার পর ইংরেজ সেনাবাহিনী নবাবের বিরুদ্ধে নতুন করে আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করলেন। ফোর্ট

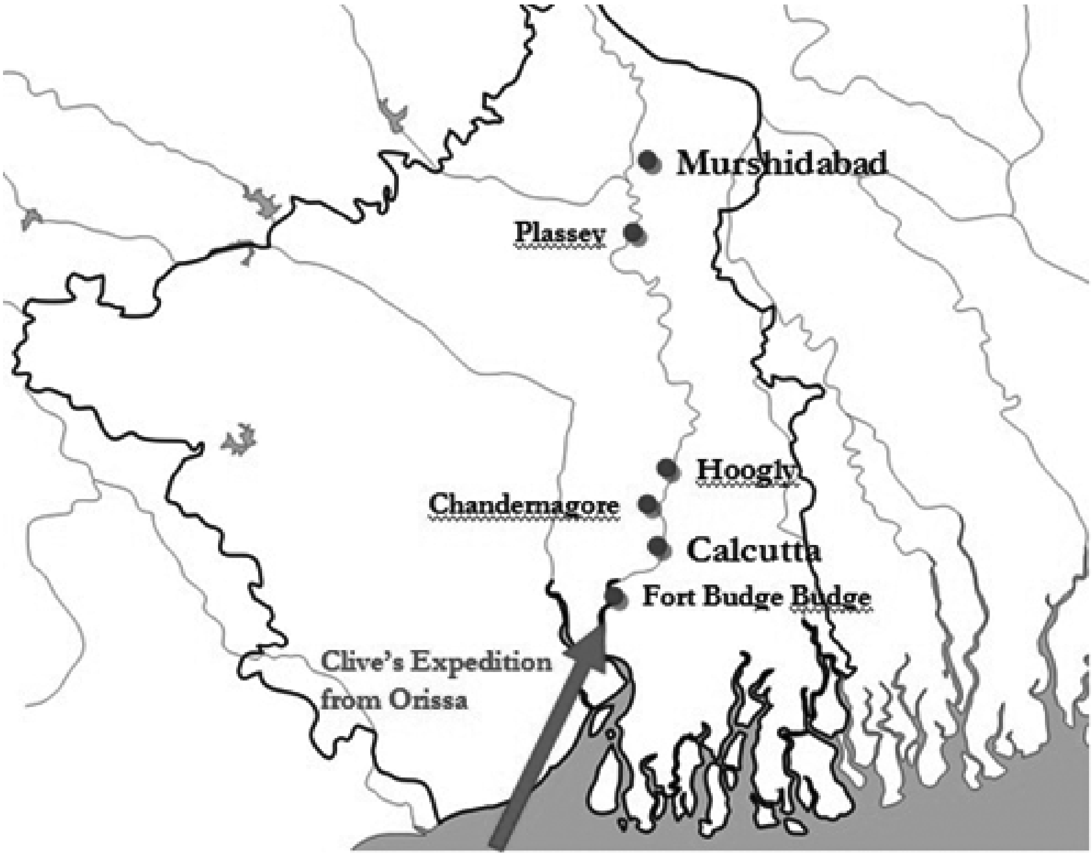

Location of important places on the map of modern West Bengal

উইলিয়ামকে শক্তিশালী করা হয় এবং উত্তর-পূর্ব দিকে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করা সম্পন্ন হয়।

উভয়ের মধ্যে সাময়িক সংঘর্ষের পর পরে ৫ই ফেব্রুয়ারি নবাব বাধ্য হলেন কোম্পানির সাথে আলিনগরে সন্ধি করতে, কোম্পানির কুঠি ফিরিয়ে দিতে এবং কোম্পানি আগে যে সুবিধা ভোগ করতো সেগুলো চালু করতে রাজি হলেন। কলকাতায় দুর্গ তৈরি করার বাধাও রইলো না। নবাব তার সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করলেন এবং মুর্শিদাবাদে ফিরে গেলেন।

ইতিমধ্যে ইউরোপে সপ্তবর্ষীয় যুদ্ধে (Seven Years War in the Europe) ফরাসি কমান্ডার ডি ব্যুসি (D Bussy) বাংলার দিকে অগ্রসর হওয়ায় খবর ইস্ট কোম্পানির কাছে পৌঁছিয়েছিল, এর ফলে কোম্পানির মনোযোগ বাংলায় ফরাসি আগ্রাসনের দিকে ঘুরে গেল। ক্লাইভ ঠিক করলেন ফরাসি শহর চন্দননগর

(কলকাতার ৩২ কিমি উত্তরে) অধিকার করবেন। ক্লাইভের নেতৃত্বে ১৪ই মার্চ ১৭৫৭ সালে কোম্পানি চন্দননগর দুর্গ আক্রমণ করলো। ফরাসিরা আশা করেছিল হুগলি থেকে নবারের সৈন্যদল তাদের সাহায্য করবে। কিন্তু হুগলির গর্ভনর নন্দকুমারকে ঘুষ দিয়ে ইংরেজরা নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিল, যাতে সে নবাবের সৈন্যদল নিয়ে ফরাসিদের সাহায্য করতে না পারে।

ফরাসি দুর্গ ভালভাবেই ব্রিটিশদের মোকাবিলা করছিল কিন্তু অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের নৌবাহিনী ২৩এ মার্চ জলপথে দুর্গ অবরোধ করার পর ফরাসিরা বেকায়দায় পড়ে, তা সত্ত্বেও দুর্গ থেকে ফরাসিদের মাসকেট আক্রমণে ওয়াটসনের নৌবাহিনীতে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়। ২৪ তারিখ সকাল ৭টায় ফরাসিরা পতাকা উড়িয়ে আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত দেয় এবং বেলা ৩টের মধ্যে আত্মসমর্পণ প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়।

নবাব চন্দননগরে আক্রমণের খবর পেয়ে প্রচণ্ড রেগে যান। তাঁর ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে পুরোনো ঘৃণা আবার ফিরে আসে, কিন্তু এখন নিজেকে আগে শক্তিশালী করার দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন। এদিকে নবাব উত্তর দিক থেকে আহমেদ শাহ দুরানির আফগান বাহিনীর আক্রমণ আবার পশ্চিমদিক থেকে মারাঠা আক্রমণের ভয়ে ছিলেন। সেইজন্য তিনি সাহস পাননি পুরো সৈন্যবাহিনীকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মোতায়েন করতে। ব্রিটিশ এবং নবাবের মধ্যে অবিশ্বাস বেড়েই চলছিল। এইসব কারণে সিরাজ কাশিমবাজারের ফরাসি কারখানার প্রধান জ্যাঁ ল (Jean Law) এবং ডি ব্যুসি (D Bussy)-র সাথে গোপনে শলা পরামর্শ শুরু করলেন। এর সাথে সাথেই নবাব রায়দুর্লভের অধীনে একটা বড় সৈন্যবাহিনীকে পলাশির দিকে পাঠালেন।

১৩.৩ যুদ্ধ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যবাহিনীর শক্তি	নবাবের সৈন্যবাহিনীর শক্তি
● ৭৫০০ ব্রিটিশ সৈন্য	● ৭০০০ পদাতিক সৈন্য
● ১০০ জন টোপাস (Topasses)	● সিরাজের ৫০০০ অশ্বারোহী বাহিনী
● ২১০০ জন ভারতীয় সেপাই	● ৩৫,০০০ পদাতিক (৫০০০ ত্রুটি পূর্ণ)
● ১০০ জন বন্দুকধারী	● মীরজাফরের ১৫,০০০ অশ্বরোহী বাহিনী (নিস্ক্রিয়া)
● ৫০ জন নাবিক	● ৫০ জন ফরাসি গোলন্দাজ
● ৮টা কামান (৬টি বড় কামান এবং ২টি ছোট কামান)	

ক্লাইভের আদেশে ২২ জুন সকালে সৈন্যবাহিনীকে ভাগিরথী নদী (হুগলি নদীর আরেক নাম) পেরিয়ে পলাশি গ্রামের আমবাগানে দ্রুত অবস্থান নিল। পরের দিন ২৩ তারিখ সকালে নবাবের সৈন্যবাহিনী তাঁবু থেকে বেড়িয়ে আমবাগানের দিকে অগ্রসর হলো। কম বেশি ৩০,০০০ সৈন্য, গাদাবন্দুক, তরোয়াল,

বর্শা ও রকেট-এ সজ্জিত, ২০,০০০ ঘোড়াসওয়ার সৈনিক তলোয়ার ও লম্বা বর্শা সজ্জিত এবং বিক্ষিপ্তভবে সাজানো ৩০০ গোলন্দাজ বাহিনী ৩২, ২৪ এবং ১৮ পাউন্ডের গোলা নিক্ষেপ করার ক্ষমতা সম্পন্ন বাহিনী। এছাড়াও ৫০ জনের ফরাসি গোলন্দাজের দল সেন্ট ফ্রাইসের (St. Frais) অধীনে আলাদাভাবে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। প্রথমে ফরাসি গোলন্দাজের দল তাদের কামান বাহিনী শকট নিয়ে অগ্রসর হলো, তাদের পেছনে জায়গা নিল নবাবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মীর মদন খান এবং দিওয়ান মোহনলালের ৫০০০ ঘোড়সাওয়ার এবং ৭০০০ পদাতিক সৈন্য। অবশিষ্ট ৪৫০০০ সৈন্য দক্ষিণে ৭৫০ মিটার দূরে ছোট টিপির কেন্দ্র করে বন্দুকের মতো বাঁকাভাবে অবস্থান নিল ঝোপ বা আমগাছের আড়ালে ক্লাইভের অপেক্ষাকৃত কম সৈন্যবাহিনীর দিকে মুখ করে। এই সৈন্যবাহিনীর ডানদিকের সেনাপতি ছিলেন রায়দুর্লভ, মাঝখানের সেনাপতি ইয়ার লতিফ খান এবং বামপ্রান্তে সেনাপতি ছিলেন ব্রিটিশ ঘনিষ্ঠ মীরজাফর।

সকাল ৮টার সময় ফরাসি গোলন্দাজ বাহিনী তাদের বড় কামান থেকে প্রথম গোলাবর্ষণ করে, এতে ব্রিটিশ রেজিমেন্টের একজন মারা যান, একজন আহত হন, এটাই নবাবের বাকি গোলন্দাজ বাহিনীর জন্য সংকেত ছিল পুরোদমে ভারি এবং বিরামহীন গোলাবর্ষণ করার। সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে ব্রিটিশদের

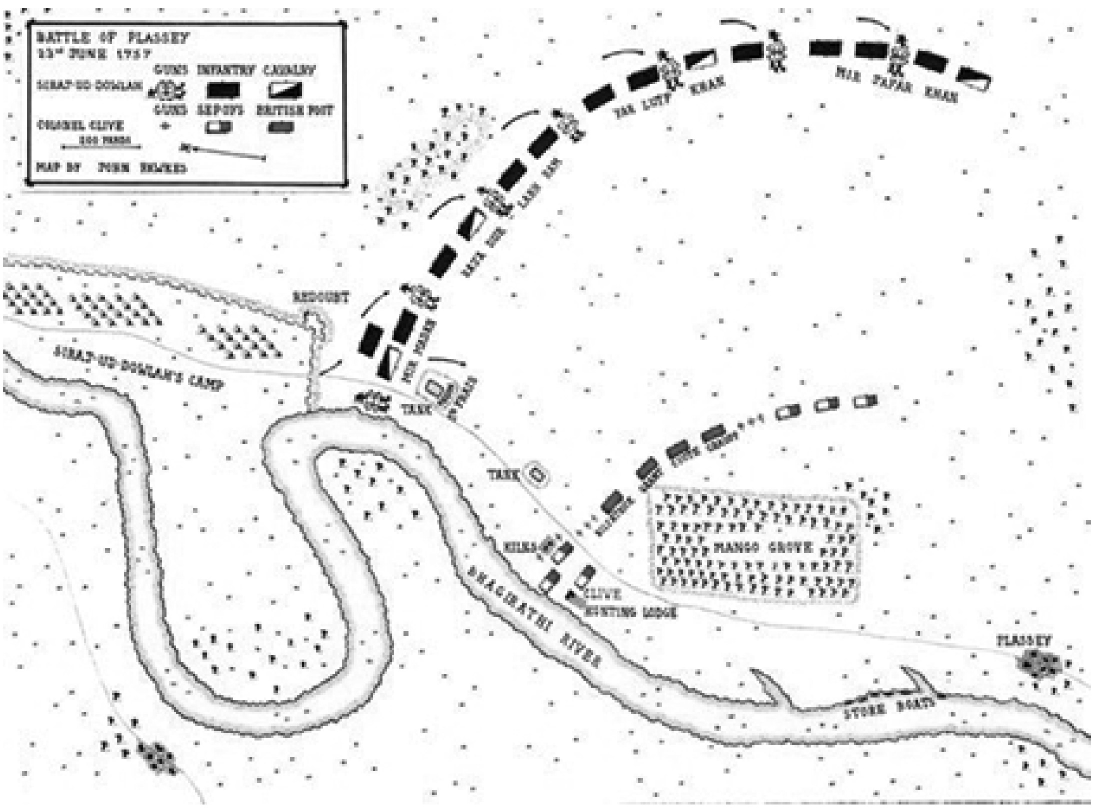

Plassey battle plan

দশজন ইউরোপিয়ান এবং ২০ জন সিপাই নিহত হলো। ব্রিটিশদের হতাহতের সংখ্যা কম হওয়ায় পেছনে কারণ ছিল গাছ এবং ঢিপির পেছনে আড়াল পাওয়ার জন্য।

৩ ঘন্টা যুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও দুপক্ষের অবস্থানগত খুব একটি পরিবর্তন হলো না। ক্লাইভ তাঁর সেনা অধ্যক্ষদের সাথে জরুরি আলোচনা করলেন পরবর্তী পদক্ষেপের ব্যাপারে, এটাই ঠিক হলো রাত্রি নামার আগে পর্যন্ত এখনকার অবস্থানই ধরে রাখার চেষ্টা করা। মাঝরাতে নবাবের তাঁবু আক্রমণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হলো। এই আলোচনা শেষ হওয়ার পরই ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হয়। ব্রিটিশরা ত্রিপল দিয়ে তাদের গোলাবারুদ ঢেকে ফলে, অন্যদিকে নবাবের সৈন্যদলের এই ধরনের কোন সুরক্ষার বন্দোবস্ত ছিল না, ফলে তাদের বারুদ ভিজে গেল এবং গোলাবর্ষণের ক্ষমতা কমে গেল, কিন্তু ক্লাইভের গোলন্দাজ বাহিনী পুরোদমে গোলাবর্ষণ চালু রাখলো। বৃষ্টি শুরু হওয়ার পরে মীরমদন খান ভাবলেন ব্রিটিশদের বন্দুক ও কামান বৃষ্টিতে ভিজে ব্যবহার করার অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে, এই সুযোগে ঘোড়াসওয়ার সৈন্য নিয়ে তিনি ব্রিটিশদের আক্রমণ করলেন, কিন্তু ব্রিটিশরা তাদের গোলাবর্ষণ বন্ধ করেনি, ফলে মীরমদন একটি গোলার আঘাতে গুরুতর আহত হন এবং ঘোড়সওয়ার বাহিনী পিছিয়ে আসে।

এই খবর পাওয়ার সাথে সাথে মীরজাফর, ক্লাইভকে খবর পাঠালেন অগ্রসর হওয়ার জন্য, রায়দুর্লভ সিরাজকে অনুরোধ করলেন সৈন্যবাহিনীকে পিছিয়ে নিয়ে পরিখার আড়ালে নিতে এবং নবাব সিরাজকে মুর্শিদাবাদে ফিরে যেতে সেনাপতিদের হাতে যুদ্ধের ভার দিয়ে। সিরাজ তাঁর পরামর্শ মতো মোহনলালকে আদেশ দিলেন তার সৈন্যবাহিনীকে পিছিয়ে পরিখার আড়াল নিতে। সিরাজ উটের পিঠে এবং ২০০০ সৈন্য নিয়ে মুর্শিদাবাদে ফিরে যেতে প্রস্তুত হলেন। দিওয়ান মোহনলাল, সিরাজকে অনুরোধ করলেন পশ্চাদপসরণ না করতে, কিন্তু সিরাজ তার কথা শুনলেন না। এটাই যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মুহূর্ত ছিল। নবাবের ফিরে যাওয়ার সাথে সাথেই বেশিরভাগ সৈন্য বিভ্রান্ত হয়ে তাদের মনোবল হারিয়ে ফেললো। আবার মীরজাফরের অধীনে থাকা সবচেয়ে বেশি সৈন্যবাহিনী ছিল সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। এই সুযোগে ক্লাইভ বাদবাকি নবাবের সৈন্যর উপর সরাসরি হামলা চালালো এবং একঘন্টার মধ্যে যুদ্ধ শেষ হলো এবং ব্রিটিশবাহিনী বিজয়ী হলো।

১৩.৪ উপসংহার : ফলাফল এবং প্রভাব

২৩ তারিখের সন্ধ্যাবেলায় ক্লাইভ, মীরজাফরের একটা চিঠি পেলেন, তাতে মীরজাফর ক্লাইভের সাথে সাক্ষাৎ-র আর্জি জানিয়েছিলেন। ক্লাইভ পরের দিন সকালে দাউদপুরে ব্রিটিশ শিবিরে সাক্ষাৎ-র সময় জানিয়ে মীরজাফরকে চিঠির উত্তর দিলেন। পরেরদিন ক্লাইভ মীরজাফরকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন, স্যালুট এবং তোপধ্বনির মাধ্যমে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার নবাব হিসাবে। তিনি তারপর মীরজাফরকে পরামর্শ দিলেন মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়ে সিরাজের পালানো আটকাতে এবং তাঁর ধনসম্পদের হদিশ বের করতে। মীরজাফর তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে ২৪ তারিখ সন্ধ্যাবেলা মুর্শিদাবাদ পৌঁছালেন, ক্লাইভ মুর্শিদাবাদে পৌঁছালেন ২৭শে জুন, ২০০ ইউরোপিয়ান সৈন্য ও ৩০০ সেপাই নিয়ে। ক্লাইভের নবাবের প্রাসাদে নিয়ে

যাওয়া হলো, সেখানে তাকে মীরজাফর এবং তার সভাসদরা তাকে অভ্যর্থনা করলেন। ক্লাইভ মীরজাফরকে নবাব হিসাবে সিংহাসনে বসালেন এবং তাকে সোনার মুদ্রার একটি প্লেট উপহার দিলেন।

সিরাজদৌল্লা ২৩ তারিখ মধ্যরাত্রে মুর্শিদাবাদে পৌছে ছিলেন। তিনি তাঁর সভাসদদের ডেকে পাঠান, সেখানে কেউ কেউ তাকে ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বলে, কেউ আবার বলেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জারি রাখতে। কেউ বলেন যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করতে। ২৪ শে জুন রাত দশটায় সিরাজ ছদ্মবেশে তার স্ত্রীকে এবং দামি মণি জহরৎ নিয়ে নৌকায় উত্তরদিকে পালান। সিরাজের উদ্দেশ্য ছিল পাটনায় পৌছিয়ে জ্যাঁ ল (Jean Law)-এর সাহায্য নেওয়া। ২৪ শে জুন মাঝরাত্রিরে মীরজাফর কয়েকটি দলকে নানাদিকে পাঠান সিরাজকে খুঁজে ধরে আনতে। ২রা জুলাই সিরাজ রাজমহল পৌছান এবং সেখানে একটি পরিত্যক্ত উদ্যানে আশ্রয় নেন। কিন্তু অতি দ্রুত একজন স্থানীয় সামরিক কর্মচারী সিরাজকে চিনতে পারেন এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে বন্দি করেন, এই সামরিক কর্মচারীকে সিরাজ একবার বন্দি করে সাজা দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আবার মীরজাফরের সম্পর্কিত ভাই। সিরাজের ভাগ্য মীরজাফরের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা ঠিক করার আগেই সিরাজকে মীরজাফরের ছেলে মীরনের হাতে তুলে দেওয়া হয়, এবং তিনি সেই রাতেই সিরাজকে হত্যা করেন। তার মৃতদেহ পরের দিন সকালে মুর্শিদাবাদের রাস্তায় সাড়ম্বরে প্রদর্শন করে আলিবর্দি খানের কবরের পাশে কবর দেওয়া হয়।

ব্রিটিশ এবং মীরজাফরের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটিশরা পায় মারাঠা ডিচ থেকে কলকাতা এবং সমুদ্রের মধ্যবর্তী সমস্ত জমিদারী এলাকা। এছাড়া ১৭১৭ ফরমান অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ, এর সাথে নৌবাহিনীর এবং সামরিক বাহিনীর জন্য ২২,০০০,০০ টাকা (£ ২,৭৫০,০০০) পাবে ব্রিটিশরা যুদ্ধে তাদের ক্ষতি হওয়ার জন্য। যদিও সিরাজের সম্পদ যা আশা করা হয়েছিল তার থেকে অনেক কম পাওয়ার ব্রিটিশরা শেঠ এবং রায়দুর্লভের সাথে ২৯এ জুন মিটিং করে ঠিক হলো আপাতত অর্দ্ধেক অর্থ ব্রিটিশদের এখনই দিতে হবে এবং সেই অর্দ্ধেক অর্থের দুই তৃতীয়াংশ মুদ্রায় এবং একতৃতীয়াংশ রত্ন বা অন্যান্য দামি জিনিসে দিতে হবে। কোম্পানির কাউন্সিলের বৈঠকের পর জানা গেল উমিচাঁদ চুক্তি অনুযায়ী কিছুই পায়নি। এই সংবাদে শুনে উমিচাঁদ পাগল হয়ে গিয়েছিল। পলাশি যুদ্ধের এই ফলাফলে বাংলায় ফরাসিরা আরও দুর্বল হয়ে পড়লো।

১৭৫৯ সালে ব্রিটিশরা মসলিপট্টমে ফরাসিদের যথেষ্ট বড় দুর্গ অধিকার করলো। ১৭৫৯ সালের মধ্যেই মীরজাফর বুঝতে পারলেন তিনি ব্রিটিশদের অধীনস্থ একজন কর্মচারি মাত্র। মীরজাফর তাঁর এই অবস্থা সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি ডাচদের সাথে যোগাযোগ করলেন এবং তাদের ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। ১৭৫৯ সালের শেষের দিকে ডাচরা তাদের জাভা বন্দর থেকে ৭টা বড় যুদ্ধ জাহাজে ১৪০০ সৈন্য পাঠালো বাংলার চুঁচুড়া তাদের ঘাঁটি (বন্দর) শক্তিশালী করার জন্য। যদিও ইউরোপে ব্রিটিশ এবং ডাচেদের মধ্যে কোন যুদ্ধ পরিস্থিতি ছিল না। ক্লাইভ ডাচেদের অগ্রসর হবার খবর পেলে স্থলপথে এবং নৌপথে সৈন্য প্রেরণ করলেন। ২৫শে নভেম্বর ১৭৫৯ সালে চুঁচুড়ার যুদ্ধে ডাচেদের তুলনামূলক বড় সৈন্যবাহিনী ব্রিটিশদের হাতে পরাস্ত হলো। ব্রিটিশরা মীরজাফরকে সরিয়ে মীরকাশেমকে বাংলার নবাব করলো। এরপর ব্রিটিশরা প্রধান ইউরোপিয়ান শক্তি হিসাবে বাংলায় আত্মপ্রকাশ করলে এবং বাংলার নবাব তাদের হাতের পুতুল পরিণত হলো।

১৩.৫ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. পলাশি যুদ্ধের কারণগুলি এবং পটভূমিকা কী ছিল?

২. পলাশির যুদ্ধের সন্ধিক্ষণ কী ছিল?

৩. কী কারণে সিরাজ হঠাৎ যুদ্ধচলাকালীন মুর্শিদাবাদে পশ্চাদপসরণ করেছিলেন?

৪. পলাশি যুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব কী ছিল?

১৩.৬ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Bandyapadhyay, Sekhar, *from Pabassey to Partition : A history of Modern India*, (N.Delhi, Orient Blackswan Pvt. Ltd. 2004).

Chaudhary, Sushil, *The Prelude of Empire : Plassey Revolution of 1757* (N. Delhi, Monohar Publication: 2000).

Sarkar, Jadunath (ed), *A History of Bengal Muslim Period* (Vol-II) (1200-1757 AD) (N. Delhi, B. R. Publishing Corporation, 2017).

Sengupta, Nitish, Land of two rivers, *A history of Bengal from Mahabharata to Mujib*, (N. Delhi : Penguin Books, 2011).

রায়, রজতকান্ত, *পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ*, আনন্দ, ১৯৯৪।

চৌধুরী, সুশীল, *পলাশীর অজানা কাহিনী*, আনন্দ, ২০০৪।

সুর, নিখিল, *আঠারো শতকের বাংলা : রাজনৈতিক চালচিত্র*, আশাদীপ, ২০১৫।

চট্টোপাধ্যায়, তপনমোহন, *পলাশীর যুদ্ধ*, কলিকাতা, ১৯৫৩।

একক ১৪ ❒ উপনিবেশিক শাসন দৃঢ়করণ

গঠন

১৪.০ উদ্দেশ্য

১৪.১ ভূমিকা

১৪.২ পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) পরবর্তী কালে ব্রিটিশ শক্তির ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ

১৪.২.১ গভর্নর ক্লাইভের অধীনে ব্রিটিশ শক্তির ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ

১৪.২.২ গভর্নর ভ্যান্সিটার্টের অধীনে ব্রিটিশ শক্তির অবস্থান

১৪.৩ নবাব মীরকাশেম ও ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি : সম্পর্কের অবনতি (১৭৬০-১৭৬৫)

১৪.৩.১ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য

১৪.৩.২ বক্সার যুদ্ধ জয়ের ফলাফল, ইংরেজদের লাভ

১৪.৩.৩ বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব (১৭৬৪)

১৪.৪ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের স্থাপনা : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

১৪.৫ উপসংহার

১৪.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১৪.৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১৪.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠের পর শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে:

- অষ্টাদশ শতকে বাংলার ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা
- পলাশীর যুদ্ধের পর (১৭৫৭) বাংলায় লাভবান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি
- ক্লাইভ দ্বারা বাংলায় ব্রিটিশ শক্তির সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা
- নবাবপদ থেকে মীরজাফরের অপসারণ
- ইংরেজদের সহায়তায় মীরকাশেম বাংলার নতুন নবাব
- ইংরেজদের মীরকাশেমকে সমর্থনের কী কারণ? কেন সমর্থন?
- মীরকাশেমের সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সংঘাত

- বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব (১৭৬৪)
- ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র স্থাপনের কারণ

১৪.১ ভূমিকা

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে বাংলার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা দেখা দেয়। বাংলার শাসকদের মধ্যে চিরকালই একটা প্রবণতা ছিল দিল্লির কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাকে অস্বীকার করে বাংলার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবার। দিল্লির সুলতানরা যদিও নিরন্তর চেষ্টা চালিয়েছিলেন বাংলাকে অধীনস্থ করার সে চেষ্টা খুব একটা সফল হয়নি তার কারণ বোধহয়—বাংলা নামক ভূখণ্ডটির কিছু ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, দিল্লি থেকে বাংলার দূরত্ব এবং ঐতিহ্যগতভাবে বাংলার স্বাধীন মনোভাবের প্রবণতা।

আকবর থেকে ঔরঙ্গজেবের শাসনকাল পর্যন্ত বাংলা ছিল মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত একটি সুবা বা প্রদেশ। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭) পরপরই অবশ্য বাংলা যদিও আইনত মুঘল শাসনের অধীনে রইল কার্যত কিন্তু অষ্টাদশ শতক থেকেই বাংলার শাসকরা স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে থাকলেন। ১৭১৭ সালে মুর্শিদকুলী খাঁ (১৭০০-১৭২৭) যখন মুঘলসম্রাট কর্তৃক বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন প্রায় সেই সময় থেকেই ব্যবহারিক অর্থে সবদিক থেকে বাংলা হয়ে উঠল একটি স্বাধীন রাজ্য। বলতে গেলে সেইসময় থেকেই শুরু হল বাংলার নবাবদের স্বাধীন রাজত্বকাল।

এই সময় যখন ইউরোপীয় বণিকদের ভারতে তথা বাংলার আগমন ঘটল তখন বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভাব হল নতুন এক শক্তির। ইংলিশ-ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি অচিরেই বুঝে ফেলল বাংলার রাজনৈতিক অরাজক অবস্থা ও নবাবি দরবারের ষড়যন্ত্রকে। আর এই অবস্থারই সুযোগ নিয়েই কোম্পানি বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌল্লাকে ২৩শে জুন ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত করে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা অনেকটা পরিমাণে হস্তগত করে ফেলল। কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা এরপর আর বাংলায় বহিরাগত হয়ে রইল না—তারা তাদের নবলব্ধ রাজনৈতিক ক্ষমতা বলে প্রায় বাংলার শাসক হয়ে উঠল। ওতোপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়ল বাংলার শাসন্যব্যবস্থার সঙ্গে। এই ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটল প্রায় ১৭৭২ সাল নাগাদ। ততদিনে বাংলায় শাসনব্যবস্থায়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে। (Sinha, 1967, p. 22)

১৪.২ পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) পরবর্তী কালে ব্রিটিশ শক্তির ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ

পলাশীর যুদ্ধের পর রবার্ট ক্লাইভ মীরজাফরকে নবাবের পদে বসান। কিন্তু মীরজাফরকে ক্লাইভ যেহেতু বিশ্বাস করতেন না তাই তার শঙ্কা ছিল মীরজাফর হয়ত অন্যান্য শক্তির সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জোট বাধতে পারেন। তাই মীরজাফর যাতে অন্য কোন শক্তির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন না করতে পারেন ক্লাইভ সেই উদ্দেশ্য মীরজাফরের উপর রাজনৈতিক চাপ বজায় রাখলেন, মীরজাফরকে নিয়ন্ত্রণে রাখবার জন্য।

ক্লাইভের লক্ষ্য ছিল যেন কোনোভাবেই বাংলার নবাবরা রাজনৈতিক ভাবে শক্তিশালী না হয়ে উঠতে পারেন। নবাবদের দুর্বল করে রাখার কারণ যাতে তারা কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা এযাবৎ বাংলায় যে সমস্ত বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আসছে সে ব্যাপারে যেন কোনরকম কোনও

বাধা সৃষ্টি না করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে ভেরেলস্টের (ফোর্টে উইলিয়াম কাউন্সিলের একজন সদস্য) মন্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে সিরাজের সঙ্গে তাঁদের সংঘাতের ফলে ইংরেজরা এটাই বুঝেছিল যে বাংলার নবাবকে যদি রাজনৈতিক ভাবে অক্ষম করে রাখা যায় তাহলে ভবিষ্যতে ইংরেজ শক্তির ধ্বংসের কোন সম্ভাবনাই আর থাকে না। (Sinha, 1967, p. 24)

১৪.২.১ গভর্নর ক্লাইভের অধীনে ব্রিটিশ শক্তির ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ

জুন ১৭৫৮ নাগাদ রবার্ট ক্লাইভ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে নিজের স্থানটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ সালে তিনি ক্যালকাটা কাউন্সিল দ্বারা নির্বাচিত হন বাংলার গভর্নর রূপে এবং কোম্পানিও এই নিবাচনকে অনুমোদিত করে। (Majumdar, 1946, 4th edition, p. 362) ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে ক্লাইভ দেওয়ান রায়দুর্লভ ও বিহারের শাসনকর্তা রামনারায়ণের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসেন। এবং এই দুই অভিজাত রাজপুরুষের বিশ্বস্ততা অর্জন করতে সমর্থ হন। এদের প্রতি বৈরিতা হেতু মীরজাফর এদের ক্ষমতা হ্রাস বা ক্ষমতাচ্যুত করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

কিন্তু ক্লাইভের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকার ফলে এরা মীরজাফরের হাত থেকে রক্ষা পান। আর ক্লাইভও এই দু'জনের আনুগত্য লাভ করেন। ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে বাংলার নবাবদের যে চুক্তি হয়েছিল তার শর্ত অনুযায়ী নবাবরা গঙ্গার আশে পাশে বিশেষ করে হুগলী নদীর নিচের দিকের অঞ্চলে নতুন কোন দুর্গ নির্মাণ বা সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। তারা বাধ্য হয়েছিলেন ফরাসিদের দখলে থাকা সমস্ত অঞ্চল ইংরেজদের হাতে প্রত্যার্পণ করতে। ইংরেজদের শত্রুদের নিজেদের শত্রু হিসাবে গণ্য করতে। ইংরেজরা এই ধরনের শর্তগুলো নবাবদের উপর চাপিয়ে ছিলেন যাতে তারা ভবিষ্যতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফরাসিদের সঙ্গে কোনোরকম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না হতে পারেন।

এছাড়া পলাশীর যুদ্ধজয়ের পর ইংরেজ কোম্পানি নবাবের সঙ্গে যে সন্ধি করে; তার ফলে কোম্পানির নিজস্ব মুদ্রাঙ্কনের অধিকার বৈধতা পায়-এর আগে এই অধিকার ছিল জগৎ শেঠের পরিবারের একচেটিয়া। শর্ত অনুযায়ী নবাব মুর্শিদাবাদের দরবারে ইংরেজ রেসিডেন্ট স্ক্যাফটনের অবস্থানকেও মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

পলাশী পরবর্তী সময়ে দেখা যায় যে বাংলার নবাব ক্রমশই ইংরেজদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। এই নির্ভরতা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রধান কারণ ছিল নবাবের আর্থিক দুর্দশা। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর থেকেই বাংলাকে নিংড়ে প্রবল অর্থশোষণ শুরু হয়। এই মন্তব্য করেছেন ঐতিহাসিক স্পীয়র। (Spear 1979, Reprint) বাংলার নবাবকে ইংরেজ কোম্পানির সৈন্য ও নৌবাহিনীকে এক বিরাট পরিমাণ অর্থ, ২,৭৫,০০০ পাউণ্ড দিতে হয়। এছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে মীরজাফর প্রায় ২২.৫ কোটি টাকা দেন কোম্পানির বিভিন্ন কর্মচারীদের। ক্লাইভ যে ব্যক্তিগত জায়গাটি পান তার আর্থিক মূল্য হিসাব করলে তা দাঁড়ায় প্রায় ৩৪,৫৬৭ টাকাতে। পলাশীর পরাজয়ের পর প্রচুর পরিমাণ ধনসম্পদ ও অর্থ বাংলা থেকে ইংরেজরা আদায় করেছিল। তার ফলে বিপুল পরিমাণ সম্পদ বাংলা থেকে বেরিয়ে ইংল্যাণ্ডে পৌঁচ্ছেছিল তাকে প্রকারান্তরে লুণ্ঠনই বলা যায়। ইতিহাসে এই লুণ্ঠনকে পলাশীর লুণ্ঠন বলে অভিহিত করা হয়।

কোনও সন্দেহই নেই যে '১৭৫৭-র বিপ্লবের' ফলে ইংরেজরা তাদের সামরিক শক্তিকে বাংলার মাটিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। (Majumdar, 1946, 4th edition, p.660) বাংলায় ইংরেজদের এই সামরিক শক্তিবৃদ্ধির প্রকাশ নানাভাবে এই সময়ে আমরা কিন্তু দেখতে পাই। যেমন ক্লাইভের সাহায্যে মীরজাফর হাজির আলি খান, পূর্ণিয়ার অচল সিং এবং মেদিনীপুরের রাজা রাম সিং-এর বিদ্রোহ দমন করেন এছাড়াও ১৭৫৯ সালে যখন মুঘল বাদশা আলি গৌহর (যিনি পরে দ্বিতীয় শাহ আলম এই উপাধ গ্রহণ করেন) বাংলায় রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করেছিলেন তখন কিন্তু ক্লাইভের সামরিক সহায়তা ও সাহায্যের ফলে নবাব মীরজাফর বিপদমুক্ত হন। এরপর নিয়মিত বেতন না পাবার কারণে যখন নবাবের সৈন্যদলে বিদ্রোহের সূচনা হয় তখনও ক্লাইভ নবাবের রক্ষাকর্তা হয়ে পাশে দাঁড়ান। এই সব ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে ক্রমে বাংলার নবাব ইংরেজ সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিলেন।

অথচ ইংরেজদের থেকে এত রকমের সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও যে মীরজাফর মুর্শিদাবাদে এবং চুঁচুড়ায় ওলন্দাজের সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন সে সম্বন্ধে চূড়ান্ত ক্ষোভ প্রকাশ করে মীরজাফরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন হলওয়েল।

১৭৫৯ সালে নভেম্বর মাসে ক্লাইভের বাহিনীর হাতে বিদেরার যুদ্ধে পরাস্ত হয় জাভা থেকে আগত ওলন্দাজ বাহিনী। এরপর ক্লাইভ শক্তহাতে দমন করেন ফরাসি শক্তিকে। ফরাসি গভর্নর ল্যালীর হায়দ্রাবাদে অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কর্নেল ফোর্ডের অধীনে ক্লাইভ সেনাবাহিনী পাঠান উত্তর সরকার অঞ্চলে ওই একই বছরে অর্থাৎ ১৭৫৯ সালে। ইংরেজ সৈন্যদের হাতে ফরাসিরা পরাজিত হয়। এর ফলে ১৭৬০ সালের মধ্যেই ইংরেজরা ভারতে তাদের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ইয়োরোপীয় বাণিজ্যিক কোম্পানি ওলন্দাজ ও ফরাসিদের যুদ্ধে পরাজিত করে ক্ষমতাচ্যুত্য করে এবং ভারতে এই দুই দেশের অধিকারে যে সমস্ত অঞ্চল ও ভূসম্পত্তি ছিল তাদের থেকে বঞ্চিত করে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসাবে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৭৬০ সালে প্রভূত ধন সম্পদের অধিকারী, বিজয়ী ক্লাইভ ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাগমন করেন।

১৪.২.২ গভর্নর ভ্যান্সিটার্টের অধীনে ব্রিটিশ শক্তির অবস্থান

নতুন গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট সঠিক বুঝেছিলেন যে ১৭৫৭'র পর থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটা অবস্থানগত পরিবর্তন ধীরে ধীরে ঘটে গিয়েছিল। একটি বাণিজ্যিক সংস্থা থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পরিবর্তিত হয়েছিল একটি সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে। (*Riyazu-S-Salatin*, 2010) তার পূর্বসুরি ক্লাইভের মতোই ভ্যান্সিটার্ট মীরজাফরকে অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে রেখেছিলেন। তবে মীরজাফরের পক্ষে তার অর্থনৈতক চাপ সহ্য করবার ক্ষমতা ছিল না। তাই মীরজাফরের থেকে আর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই বুঝে ভ্যান্সিটার্ট মীরজাফরের জামাই মীরকাশেমের সঙ্গে গোপনে এক চুক্তি করেন। মীরকাশেমকে পরবর্তী নবাব হিসাবে বাংলার মসনদে বসানোর প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং তার জন্য ভান্সিটার্ট দাবি করলেন অর্থের। দাবি করলেন বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম। এই তিন অঞ্চল থেকে কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের অধিকার। মীরকাশেম মেনে নিলেন সমস্ত দাবি। গোপন চুক্তির শর্ত অনুযায়ী নতুন নবাব

মীরকাশেমের থেকে ভ্যান্সিটার্ট ও কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যরা লাভ করলেন প্রচুর উপঢৌকন ও বিরাট অঙ্কের অর্থ। সব মিলিয়ে প্রায় দু'কোটি পাউণ্ডের মতো। এই ঘটনা থেকে একটা চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হল ইংরেজ বণিক কোম্পানি বাংলার রাজনৈতিক এতটাই ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল যে কোম্পানি বাংলার নবাবপদটি কেনাবেচা করবার মতো জায়গায় পৌঁছেছিল। ইংরেজ বণিকসংস্থা, সত্যি কথা বলতে, বাংলাকে মীরকাশেমের কাছে বিক্রি করে দিল। এরপর কোম্পানি আধিকারিকরা উঠে পড়ে লাগলেন পুরানো নবাব মীরজাফরকে যেনতেন প্রকারণে বাংলার মসনদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টায়। সে মীরজাফরের থেকে ইংরেজরা একসময়ে প্রচুর অর্থ ও সম্পদ লাভ করেছ। সেই মীরজাফর আর তাদের আর্থিক দায় না মেটাতে পারার জন্য ইংরেজদের কাছে একেবারে গুরুত্বহীন হয়ে পড়লেন। আর্থিক চাহিদা মেটানোর জন্য বাংলার নবাবপদে নিলামে তুলে সেটি সর্বোচ্চ দরে বিক্রি করে দেওয়া—এইটে যেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটা লাভজনক ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়াল।

১৪.৩ নবাব মীরকাশেম ও ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি : সম্পর্কের অবনতি (১৭৬০-১৭৬৫)

যেহেতু মীরকাশেমের থেকে প্রাপ্ত অর্থ ও ধন সম্পদ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষে সাহায্য করেছিল আর্থিক সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে তাই মীরকাশেমের শাসনকালের গোড়ার দিকে কোম্পানির সঙ্গে মীরকাশেমের একটা মোটামুটি সৌজন্যমূলক সু-সম্পর্ক বজায়ছিল। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মীরকাশেম কোম্পানিকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব আদায়ের অধিকার প্রদান করেন। এছাড়াও কোম্পানিকে সোরার ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকারের অনুমতি দেন আর এই সঙ্গে কোম্পানিকে সিলেট থেকে 'চুনাম' বা চুন কেনারেও অধিকার দেন। দেখা যায় মীরকাশেমের সঙ্গে কোম্পানির সম্পর্ক ধীরে ধীরে তিক্ত হয়ে উঠেছে আর এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে মীরকাশেম ইংরেজদের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হচ্ছেন ও শেষপর্যন্ত ১৭৬৪ তে বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে পরাজিত হচ্ছেন।

মীরাকশেম একজন দক্ষ শাসক ছিলেন। বাংলায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি প্রশাসনিক আমলাতন্ত্রকে পুনর্গঠন করতে উদ্যোগী হয়। আর এই কারণে তিনি বিনা দ্বিধায় বিহারের অত্যন্ত ক্ষমতাবান রাজপুরুষ রামনারায়ণকে তাঁর পদ থেকে বরখাস্ত করেন। রামনারায়ণ ছিলেন ইংরেজদের আস্থাবাজন। ক্লাইভের আমল থেকেই ইংরেজদের সমর্থন রামনারায়ণকে ক্ষমতাশালী করে তুলেছিল।

রাজ্যের অর্থনীতি সুসংগঠিত করবার প্রয়োজনে মীরকাশেম রামনারায়ণের যখন আয় ব্যয়ের হিসাব তলব করেন তখন হিসাব দাখিলে অসম্মত রামনারায়ণ মীরকাশেম বিরোধী বলে খ্যাত দুই ইংরেজ মেজর কারণাক ও কর্নেল কূটের সঙ্গে জোট বাঁধেন। বি.বি. চৌধুরীর লেখায় আমরা এই ব্যাপারে ইঙ্গিত পাই। (Sinha, 1967) নবাব মীরকাশেম তার সৈন্যবাহিনীক পুনগর্ঠন করে আরো শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন। এই নবগঠিত সৈন্যবহিনীর শক্তি পরীক্ষা করতে তিনি নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা নেন এবং সেই উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠনের জন্যে মীরকাশেম আরমেনীয় এবং ইয়োরোপীয় সেনাপতিদের নিযুক্ত করেন বাংলার সেনাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য।

যুদ্ধের কৌশলে পারদর্শী তাতার বা আফগান গোষ্ঠীর লোকেদের, পারস্য দেশের লোকেদের মীরকাশেম তার সৈন্যদলে অন্তর্ভুক্ত করেন। বলাইবাহুল্য যে মীরকাশেমের এই মারাত্মক রকমের আক্রমণাত্মক সামরিক শক্তি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ইংরেজদের সন্দিহান করে তুলল। এই সব দেখে ভেরেলস্টে মনে করেছিলেন যে আত্মশক্তিকে বলীয়ান মীরকাশেম নিজের শাসন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে আর ইংরেজ সাহায্যের মুখাপেক্ষী হবেন না। বরঞ্চ আত্মবলে বলীয়ান মীরকাশেম এবার ইংরেজদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবেন। (Sinha, 1967)

১৪.৩.১ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য

মীরকাশেমের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্কের অবনতি—এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। বিতর্কের মূল কেন্দ্র দুটি। একদল ঐতিহাসিক মনে করেন ইংরেজ বণিক কোম্পানির বাংলায় বিনা শুল্কে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের যে অধিকার ছিল কোম্পানির কর্মচারীরা সেই সুযোগের অপব্যবহার করছেন। এবং ইংরেজ বণিকেরা অন্যান্যভাবে ব্যক্তিগত ব্যবসাবাণিজ্যও বিনা শুল্কে করছেন তাই ঐতিহাসিকদের মতে এই বিষয়টিই মীরকাশেমের সঙ্গে ইংরেজদের বিবাদের প্রধান কারণ। আর একদল ঐতিহাসিকদের বক্তব্য এই যে মীরকাশেম ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা একজন নবাব। তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল বিদেশি কোম্পানির অধীনস্থতা মেনে না নিতে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিদেশি বণিক কোম্পানির আওতা থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনভাবে নিজের রাজ্য পরিচালনার এবং বাংলা থেকে ইংরেজদের বিতারণের। ভেরেলস্টের যে মন্তব্য আমরা এর আগে অলোচনা করেছি সেই মন্তব্য দু'জনে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল ওয়েল ও নন্দলাল চ্যাটার্জী। তাঁদের মতে মীরকাশেমের এই স্বাধীনচেতা মনোভাব তাঁকে ইংরেজদের সঙ্গে একটা না একটা সময়ে সংঘর্ষে নিয়ে যেতই। এই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বিষয়টিকে মীরকাশেম জেনে বুঝেই হাতিয়ার করেছিলেন সেই সংঘর্ষের সূচনা হিসাবে। বিনয়ভূষণ চৌধুরী অবশ্য এই মত অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁর মতে যেহেতু ইংরেজরা আইনতঃ বাংলার শাসক ছিলেন এবং সমগ্র বাংলাও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীনও ছিল তাই ইংরেজদের অধীন থেকে মীরকাশেমের নিজেকে স্বাধীন করার প্রশ্নই ওঠে না।

অন্যদিকে শুধুমাত্র কোম্পানিকেই প্রদত্ত বাংলায় বিনাশুল্কে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের অধিকারকে ইংরেজ বণিকরা ও কোম্পানির চাকুরেরা তাদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে একদিকে নিজেরা যেমন প্রভূত পরিমাণে মুনাফা লাভ করছিলেন ঠিক তেমনি অন্যদিকে নবাবের কোষাগারকেও তাঁরা বঞ্চিত করছিলেন তার প্রাপ্য নির্ধারিত ও ন্যায্য পরিমাণের বাণিজ্য শুল্ক থেকে। এর ফলে ঘটছিল চরম আর্থিক লোকসান। নিঃসন্দেহে বাংলার নবাব হিসাবে মীরকাশেম এই অবস্থার বিরুদ্ধে তো ব্যবস্থা নিয়ে চেষ্টা করবেনই। (Sinha, 1967)

অনেক ঐতিহাসিকের মতে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও সেই সম্পর্কিত সমস্যা ছিল নবাব মীরকাশেম আর ইংরেজদের মধ্যে বিরোধের অন্যতম কারণ। ইংরেজদের দাবি ছিল যে বাদশাহ ফারুকশিয়ারের ১৭১৭ সালের ফরমান অনুসারে তারা বাংলায় বিনাশুল্কে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য করবার অধিকার পেয়েছিল। মুর্শীদকুলি খান ও তাঁর পরবর্তী কোনও নবাবই ইংরেজদের ফরমানের এই ব্যাখ্যা মানতে নারাজ ছিলেন। তৎসত্ত্বেও কোম্পানির অধীনে চাকুরীরত কর্মচারী বিনা শুল্কে অবাধে বাংলায় ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন।

পলাশী যুদ্ধে জয়ের পর তারা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠে। বিশেষতঃ মীরজাফরের শাসনকালে এবং মীরকাশেমে সময়ে এ অবস্থা চরমে গিয়ে পৌছায়। (Sinha, 1967, p. 35) ভ্যান্সিটার্ট পরিস্থিতি বুঝে ইংরেজ কর্মচারীদের এই অবাধে বিনাশুল্কে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রস্তাব দিয়েছিলেন দস্তক (বাণিজ্যের ছাড়পত্র) সংক্রান্ত ব্যাখ্যাকে মেনে নিতে এবং নবাবকে তাঁর প্রাপ্য বাণিজ্যকর প্রদান করতে। দুর্ভাগ্যবশত এই প্রস্তাব ভ্যান্সিটার্ট বাস্তবায়িত করতে পারেননি। কারণ ক্যালকাটা কাউন্সিল এ প্রস্তাব অনুমোদন করতে অস্বীকার করে।

এদিকে সমস্যা হল যে ইংরেজ বণিকদের বিনা শুল্কে বাংলার অভ্যন্তরে ব্যবসাবাণিজ্য করবার যে সুযোগ ছিল স্থানীয় বণিকদের সে সুযোগ ছিল না। তাদের কিন্তু বাণিজ্য কর দিতে হত ফলে তারা এক অসম প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়ল। কারিগর ও উৎপাদদের আর্থিক অবস্থাও এর পরিণামে সঙ্গীণ হয়ে উঠল। শুল্ক থেকে আয় না হওয়াতে নবাবের বার্ষিক আর্থিক ক্ষতি পরিমাণ দাঁড়াল ২৫ লাখ টাকায়। এই কারণে স্থানীয় মানুষজনেরা সাংঘাতিক ভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। মীরকাশেম তাই ব্যস্ত হলেন সমস্যার সমাধানে। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন যে ইংরেজ ও স্থানীয় বণিকদের অবস্থার মধ্যে সমতা আনতে তিনি অন্ততঃ দু'বছরের জন্য স্থানীয় বণিকদের বাণিজ্যশুল্ক মকুব করে দেবেন।

স্থানীয় বণিকদের সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারী বণিকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। বাণিজ্য ক্ষেত্রে যে বিশেষ সুবিধার ফলে তারা মুনাফা করত সেই সুযোগ সুবিধাগুলো অর্থহীন হয়ে দাঁড়াল। বাণিজ্যিক বাজারে মুনাফা লাভের যে একচেটিয়া আধিপত্য তাদের ছিল সেটা আর রইল না। নবাবের এই সিদ্ধান্তের বৈধতা সম্পর্কে তারা সন্দেহ প্রকাশ করে দাবি তুললেন যে একমাত্র ভারত সম্রাটেরই অধিকার আছে বাণিজ্য শুল্ক মকুব করবার, বাংলার নবাবের নয়। এপ্রসঙ্গে বি. বি. চৌধুরী দেখিয়েছেন যে কোম্পানির চাকুরেরা মীরকাশেমের উপর এতটাই বিরূপ হয়েছিলেন যে তারা নবাবের নামে মিথ্যে গুজব ছড়িয়ে অপবাদ দিতে লাগলেন যে তিনি তুঁত ও তুলোর উৎপাদনও বন্ধ করে দিয়েছেন।

অবশেষে ইংরেজরা নবাবের কাছে আবেদন জানালেন তার সিদ্ধান্তে নাকচ করবার জন্য এক প্রতিশ্রুতি দিলেন যে লবণের উপর তারা ২$^{১/২}$% শুল্ক দিতে রাজী আছেন। নবাব মীরকাশেম ততদিনে ইংরেজদের উপর থেকে বিশ্বাস উঠে গেছে, তিনি তাদের একটি দাবিও পূরণ করলেন না।

আসল কথা হল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও ভালোরকমভাবে জানত যে তার কর্মচারীরা দোষী। তবুও কোম্পানি কখনও কোনভাবেই তার কর্মচারীদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টাই করেনি। মীরকাশেমকে তার প্রাপ্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত করে ইংরেজরাই আসলে দু'তরফের বিবাদকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। সাধারণ মানুষ এবং স্থানীয় বণিকারের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছেন। বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা পুনরুদ্ধার করবার লক্ষ্য নিয়ে কোম্পানির পাটনা ফক্টরির প্রধান এলিস পাটনা শহর আক্রমণ করেন। এলিস পরাজিত হন ও তার ঘাঁটি ধ্বংস করা হয়।

১৪.৩.২ বক্সার যুদ্ধ জয়ের ফলাফল, ইংরেজদের লাভ

নবাব এবং ইংরেজ স্বপক্ষের ভিতরেই ধীরে ধীরে অসন্তোষ জমা হয়ে উঠেছিল যার ফলস্বরূপ যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে দাঁড়াল। যুদ্ধ বাঁধল ১৭৬৩-এ। যদিও কোম্পানির সৈন্যসামন্ত নবাবের সৈন্যসামন্তের

তুলনায় সংখ্যায় কম ছিল তাসত্ত্বেও কোম্পানির ফৌজের হাতে মীরকাশেম কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, গিরিয়া, সুটি, উদয়নালা এবং মুঙ্গেরে উপর্যুপরি পরাজিত হলেন। মীরকাশেম পালিয়ে গেলেন আওয়াধে। সেখানে গিয়ে নবাব সুজা-উদ্-দৌল্লা আর মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের (যিনি রাজধানী দিল্লি ছেড়ে এসে আওয়াধে আশ্রয় নিয়েছিলেন) সঙ্গে কূটনৈতিক জোট বন্ধনে আবদ্ধ হলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। প্রস্তুত হলেন আরও একবার যুদ্ধের জন্য। ২২ শে অক্টোবর ১৭৬৪ সালে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী সেনাপতি হেক্টর মনোরের নেতৃত্বে বিহারের বক্সারে ভারতীয় জোট শক্তিকে পরাজিত এবং বিধ্বস্ত করল। পরাজিত দিল্লির বাদশাহ তার দু'ই মিত্রকে পরিত্যাগ করে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করলেন। বিপদ বুঝে আওয়াধের নবাব সুজা-উদ-দৌল্লা পালিয়ে গেলেন রোহিলখণ্ডে আর মীরকাশেম ইংরেজদের হাত থেকে বাঁচতে আত্মগোপন করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা পালিয়ে বেড়াতে বেড়াতে অবশেষে ১৭৭৭এর মে মোসে দিল্লীর কাছে কোতওয়াল বলে এক জায়গা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে মৃত্যু বরণ করলেন। ১৭৬৫ সালে ক্লাইভ ইংল্যাণ্ড থেকে আবার একবার ভারতে ফিরে এলেন এবং দ্বিতীয়বারের জন্য নিযুক্ত হলেন বাংলার গভর্নরের পদে। ফিরে এসে ক্লাইভের প্রথম কাজ হল বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত দুই ভারতীয় শাসক দ্বিতীয় শাহ্ আলম ও সুজা-উদ্-দৌল্লার সঙ্গে সন্ধি স্বাক্ষর করা। ১৭৬৫ সালে এলাহাবাদে দুই শাসকের সঙ্গে দুটি সন্ধি স্বাক্ষর করেন ক্লাইভ। ভারতের বাদশা দ্বিতীয় শাহ আলমের ক্ষমতা বহুলাংশে খর্ব করা হয় এবং নামে মাত্র বাদশাহে হয়ে তিনি এরপর ইংরেজদের আচরণে তাদের হাতের পুতুল হয়ে এলাহাবাদে দুর্গে বসবাস করতে থাকেন। ১৭৬৫ সালের এলাহাবাদ সন্ধির ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের থেকে লাভ করল বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি অর্থাৎ এই অঞ্চল থেকে রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার। রাজস্ব সংগ্রহের অধিকারের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল অসামরিক প্রশাসনের দায়িত্ব, বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব ইত্যাদি। বাংলা বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করবার ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী রাজ্য বাংলায় নিজের আইনসিদ্ধ, স্থায়ী অবস্থানকে সুদৃঢ় করে তুলতে সক্ষম হল। এই প্রাপ্তির বিনিময় কোম্পানি সম্রাটকে কারা ও এলাহাবাদ সমর্পণ করল এবং বছরে মাত্র ২৬ লাখ টাকা দিতে সম্মত হল।

সন্ধির শর্ত অনুযায়ী আওয়াধের নবাব সুজা-উদ্-দৌল্লা বাধ্য হলেন কোম্পানি ৫০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে। এর পরিবর্তে তিনি কারা ও এলাহাবাদ বাদে পুরো আওয়াধ ফিরে পেলেন। যদিও নবাবকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে কোম্পানি আওয়াধে সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত করে সেনাবাহিনী মোতায়নের ব্যবস্থা করল। কোম্পানির তরফ থেকে জানানো হল নবাবের সুরক্ষার জন্য কোম্পানির এই ব্যবস্থা। বহির্শক্তি ঠেকাবার জন্যই এই ব্যবস্থা। আসল কথা হল আওয়াধকে পরিণত করা হল একটি বাফার অঞ্চলে অর্থাৎ ইংরেজদের নবলব্ধ বাংলাকে মারাঠা বর্গিদের আক্রমণের ধাক্কা রাখতে সক্ষম এমন একটি অঞ্চলে।

বাংলার সিংহাসনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পুনর্স্থাপন করল মীরজাফরকে। আর মীরজাফরও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কোম্পানির সকল কর্মচারী, আধিকারিকদের প্রচুর পরিমাণে পুরস্কৃত করলেন। মীরকাশেমের যে আদেশে বাংলায় বাণিজ্যরত সব বণিকদের বাণিজ্যশুল্ক মাফ হয়েছিল মীরজাফর যে আদেশ খারিজ করে দিলেন ফলে কোম্পানি বাণিজ্য ব্যাপারে যে সব বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ

করত সেগুলো আবার ফিরে পেল। মীরজাফরের মৃত্যুর পর তার ছেলে নাজাম-উদ-দৌল্লা বাংলার নবাব হন। এর সঙ্গে কোম্পানির যে চুক্তি হয় তাতে সিদ্ধান্ত হয় যে যেহেতু রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে কোম্পানি অভিজ্ঞতা নেই তাই বাংলার দেওয়ান হিসাবে কোম্পানি এ কাজ করবে নায়েব সুবাদার বা নায়েব নিজামে মাধ্যমে।

১৪.৩.৩ বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব (১৭৬৪)

পিটার মার্শালের চোখে বক্সারের যুদ্ধে ব্রিটিশদের জয়লাভ বাংলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যার ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারিত। মার্শালের কথায় ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দেওয়ানি গ্রহণ করবার পর বাংলা যেন স্পষ্টতই দুই ভাগে বিভাজিত হয়ে গেল। মুঘল বাংলা রূপান্তরিত হতে শুরু করল ব্রিটিশ বাংলায়। (Marshall, 1990, Reprint) বলা হয় যে পলাশীর জয় এসেছিল ষড়যন্ত্রের ফলে কিন্তু বক্সারে কোম্পানির জয়লাভের কারণ ছিল নিঃসন্দেহে তার শ্রেষ্ঠতর সামারিক কৌশল ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের ফলে। এ যুদ্ধের ফলাফল ছিল চূড়ান্ত ও নিষ্পত্তিমূলক। রমেশচন্দ্র মজুমদার ও অন্যান্যরা রচিত (*An Advanced History of India*)-তে রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন যে, মীরকাশেমের সঙ্গে কোম্পানির যুদ্ধ কিন্তু যথার্থই দুই পক্ষের সামরিক শক্তির লড়াই ছিল তাই বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের জয় তাদের বাংলা বিজয়ে ন্যায্য অধিকারী বলে চিহ্নিত করেছিল এবং এটাও স্পষ্ট হয়েছিল যে ইংরেজদের জয় কখনোই হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনা নয় তা যথাযথভাবে যুক্তিনির্ভর ঘটনাবলীর কার্যকারণের ফল। (Majumdar, 1946, 4th edition)।

১৭৬৫ আগেও ব্রিটিশরা বাংলায় ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত প্রচুর সুযোগ সুবিধা ও অধিকার ভোগ করেছিল ঠিকই তবে দেওয়ানি লাভের পর আইনতভাবে বাংলার শাসন ব্যবস্থায় সরকারীভাবে পদমর্যাদায় কোম্পানি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল। নবাবের পক্ষে কোম্পানিকে অগ্রাহ্য করে বাংলা শাসন অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল তার প্রধান কারণ রাজ্যের প্রধান আয়ের উৎস ভূমি রাজস্ব আর সেই রাজস্ব সংগ্রহের অধিকারী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ফলে নবাব কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠলেন এবং অচিরেই ইংরেজদের হাতের পুতুলে পরিণত হলেন। ব্রিটিশরা হয়ে উঠল সমৃদ্ধশালী, সম্পদশালী বাংলাদেশের প্রকৃত শাসক।

বক্সারের যুদ্ধে ভারতীয় শাসকদের, বিশেষ করে মুঘল সম্রাটের সামরিক দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল। অপরদিকে ইংরেজদের সামরিক বল যে উন্নততর যে বিষয়টাও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

ভারতের বাদশাহকে যে তারা পরাজিত করে তাদের অধীনস্থ করতে পারে নিজেদের এই ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে ইংরেজরা হয়ে উঠেছিল অসম্ভব আত্মবিশ্বাসী আর গৌরবান্বিত। আওয়াধের নবাব আর দ্বিতীয় শাহ আলমের পরাজয় উত্তর ভারতে এবং পরবর্তীতে সমগ্র ভারতের উপর রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের পথ করে দিয়েছিল।

১৪.৪ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের স্থাপনা : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

পি. জে. মার্শালের মতে ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ যতদিন পর্যত পিটস্ ইন্ডিয়া এ্যাক্ট গৃহীত হয়নি ততদিন অবধি ব্রিটিশদের ভারতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র স্থাপনের ব্যাপারে বিশেষ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না।

ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকেও ভারতবর্ষে রাজ্য বিস্তারের কোন সুসাংগঠিত নীতিও গ্রহণ করা হয়নি। অষ্টাদশ শতকে মুঘল শাসনব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার ফলে বাংলা অর্থাৎ ভারতের যে রাজনৈতিক অরাকতা সৃষ্টি হয়েছিল ইংরেজরা কেবল সেই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছে মাত্র। (Marshall P. J. 1989)

সি. এ. বেইলী যে তর্কের অবতরণ করেছেন তাতে তাঁর যুক্তি হল যে চিত্র ১৭৮০-র পরেও দেখা যায় তা হল ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রসারের কারণ কিন্তু বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষা ভারতবর্ষে ইংরেজদের অর্থনৈতিক ও সামরিক চাহিদা পূরণই ছিল মূল কারণ। (Bayly 1989) বেইলির এই "Sub-imperialism" বা উপ-সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে একসঙ্গে এটা মনে রাখা দরকার যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যনীতি ছিল ভীষণ রকমের আগ্রাসী। কোম্পানি কিন্তু সর্বদা বাণিজ্যের প্রসার ঘটানোর জন্য সর্বপ্রকারে বণিকদের সহায়তা করেছে এমনকি দরকার মতো সশস্ত্র সেনাবাহিনী দিয়েও সাহায্য করেছে। বিশেষ করে রাজা দ্বিতীয় চার্লস ও দ্বিতীয় জেমস। তাদের উদ্দেশ্য ছিল দেশ বিদেশের ধনসম্পদ আহরণ করে নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দৃঢ় করা যাতে তাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে। ব্রিটিশ নৌশক্তিকে তারা ব্যবহার করেছে বাণিজ্য প্রসারের জন্য এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটিশ ঘাঁটি ও ফ্যাক্টরী সুরক্ষিত করবার জন্য। ফিলিপ লসন এ ব্যাপারটিকে সমর্থন জানিয়েছেন এই বলে যে "আঞ্চলিক বাজারগুলোতে ইংরেজ বন্দুকের এটাই নৈতিক অর্থনীতি।" (Lawson 1993) শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ও দেখিয়েছেন যে ইংরেজদের নৌ-কামানের ভয়েই ভারতীয় শাসকরা আঞ্চলিক বাজারে বাণিজ্যের নামে ইরেজ বণিকদের দৌরাত্ম্য সহ্য করতে বাধ্য হয়েছেন এবং তাদের আক্রমণ করতে দ্বিধা করেছেন। (Bandhopadhyaya 2004) ভারতে গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত যুদ্ধে ইংরেজরা জয়লাভ করেছিল তাদের শক্তিশালী সামরিক ও নৌশক্তির সাহায্যে। বাংলায় যেমন অমরা দেখেছি। আর এই বাংলায় ইংরেজ শক্তির গোড়াপত্তন থেকেই শুরু হয়েছিল ভবিষ্যতে সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার।

১৪.৫ উপসংহার

- অষ্টাদশ শতকের গোড়া থেকেই বাংলার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হল যখন পলাশীর যুদ্ধে (২৩শে জুন, ১৭৫৭) ইংরেজরা সিরাজ-উদ্-দৌল্লাকে হারিয়ে বাংলায় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করল।
- ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি যেমন, এই যুদ্ধজয়ের ফলে আর্থিক দিক থেকে লাভবনা হল ঠিক যেমনি ক্লাইভেরও ব্যক্তিগত ধন সম্পদ বৃদ্ধি পেল।
- গভর্নর ক্লাইভ বাংলায় ব্রিটিশ ক্ষমতার কেন্দ্রিকরণ করেন। এদিকে নবাব মীরজাফর সম্পূর্ণরূপে কোম্পানির সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন।
- ~~১৭৬০ সালে ক্লাইভ যথাক্রমে ওলন্দাজ ও ফরাসিদের পরাজিত করেন। বাংলায় ইংরেজ শক্তির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়।~~

- ক্লাইভ যেমনভাবে মীরজাফরকে অর্থনৈতিক চাপে রেখেছিলেন ঠিক তেমনি ভ্যান্সিটার্টও মীরজাফরকে একই কায়দায় অর্থনৈতিক চাপে রেখেছিলেন। যখন মীরজাফর কোম্পানির বিরাট অর্থের চাহিদা মেটাতে অক্ষম হলেন তখন ইংরেজরা তাকে সিংহাসনচ্যুত করে মীরকাশেমকে বাংলার মসনদে বসালেন। ধীরে ধীরে নতুন নবাব মীরকাশেমের সঙ্গেও কোম্পানির সম্পর্কের অবনতি হতে শুরু করল। এর কারণ স্বাধীনচেতা মীরকাশেম কোম্পানির অধীনে থাকতে নারাজ ছিলেন এবং কোম্পানি স্বার্থবিরোধী বেশ কয়েকটি সংস্কার প্রবর্তন করেছিলেন।
- কোম্পানির সঙ্গে নবাব মীরকাশেমের সম্পর্কের অবনতির কারণ—এই বিষয়কে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। এক দল ঐতিহাসিকরা কোম্পানির চাকুরেদের ব্যক্তিগত অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বিষয়টিকে সম্পর্ক অবনতির কারণ মনে করেন। অন্য দল মনে করেন মীরকাশেমে স্বাধীনচেতা মনোভাবই অবনতির মূল কারণ।
- বক্সার যুদ্ধের (১৭৬৪) সরাসরি কারণ ছিল নবাব কর্তৃক দু'বছরের জন্য দেশীয় বণিকদের বাণ্যিজ শুল্ক থেকে ছাড় দেওয়ার আদেশ যার ফলে তারা বিনাশুল্কে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে লিপ্ত ইংরেজ বণিক ও ইংরেজ কোম্পানির সমকক্ষ হয়ে উঠবে। সমসুযোগের ভাগীদার হবে।
- মীরকাশেম একটি চতুর কূটনৈতিক জোট গড়ে তোলেন আওয়াধের নবাব সুজা-উদ্-দৌল্লা আর মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সঙ্গে। শাহ আলমকে এই জোটে সামিল করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা।
- ২২শে অক্টোবর ১৭৬৪ ভারতীয় জোটশক্তির সঙ্গে বিহারের বক্সারে কোম্পানির ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি মেজর হেক্টর মনরো ভারতীয় জোটশক্তিকে পরাজিত করেন।
- বক্সার যুদ্ধে পরাজিত দ্বিতীয় শাহ আলম আর আওয়াধের নবাবকে ইংরেজরা বাধ্য করল রীতিমত অপমানজনক সন্ধি সাক্ষর করতে। ইংরেজদের হাতে মোগল বাদশাহের পরাজয় ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যা যুগ পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণ সূচনা করেছিল।
- মোগল সম্রাট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলার দেওয়ানি প্রদান করেন। এদিকে মীরকাশেমের বদলে মীরজাফর আবার বাংলার নবাব পদে অধিষ্ঠিত হন।
- আওয়াধের নবাব আর দ্বিতীয় শাহ আলমের পরাজয় ভারতে ব্রিটিশ রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের পথ প্রশস্থ করে দিয়েছিল।
- পি. জে. মার্শালের বক্তব্য অনুযায়ী ভারতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র স্থাপন করার ইংরেজদের কোনও সুনির্দিষ্ঠ পরিকল্পনা ছিল না। অষ্টাদশ শতকে যেমন যেমন ভাবে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে তারাও ঠিক তেমনভাবে সেই পরিবর্তিত প্রেক্ষিতের সুযোগ নিয়েছে। যদিও একথা যে ব্রিটেনের রাজশক্তি সর্বোতভাবে কোম্পানির আগ্রাসী বাণিজ্যনীতিকে সমর্থন করেছে এবং প্রত্যাশিত ফলাফল লাভ করেছে।

১৪.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. পলাশীর যুদ্ধে জয়ের পর ইংরেজরা কীভাবে এবং কতটা লাভবান হয়েছিল?

২. পলাশীর পর ক্লাইভ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে কতটা লাভবান হয়েছিল?

৩. ১৭৫৭-র পরবর্তী সময় মীরজাফরকে অধীনে রাখবার জন্য ক্লাইভ কী কী প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন?

৪. ব্রিটিশ শক্তি কীভাবে বাংলা থেকে যথাক্রমে ওলন্দাজ ও ফরাসি শক্তিকে বিতাড়িত করে?

৫. ভ্যান্সিটার্ট কীভাবে মীরজাফরকে অর্থনৈতিক চাপে রেখেছিলেন?

৬. বাংলার নবাবপদটিকে নীলামে তুলে সেটিকে সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয়—ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটা লাভজনক ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

৭. মীরকাশেমের সঙ্গে কোম্পানির সম্পর্কের অবনতির কারণ কী কী?

৮. আপনার কি মনে হয় বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বিষয়টি—মীরকাশেম ও কোম্পানির দ্বন্দ্বের মূলে ছিল?

৯. বক্সার যুদ্ধের প্রেক্ষিত আলাচনা করুন।

১০. সম্রাট শাহ্ আলম ও আওয়াধের সুজা-উদ্-দৌল্লার সঙ্গে সাক্ষরিত সন্ধির ফলে কোম্পানি কতটা লাভবান হয়েছিল?

১১. মীরজাফরকে পুনরায় বাংলার নবাবপদে ফিরিয়ে আনার ফলে কোম্পানির কী লাভ হয়েছিল?

১২. বক্সারের যুদ্ধের রাজনৈতিক গুরুত্ব কী?

১৩. আপনারা কি পি. জে. মার্শালের বক্তব্যের সঙ্গে সহমত যে ব্রিটিশদের ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের কোনও পরিকল্পনা ছিল না, তারা কেবল বাংলার পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছে মাত্র?

১৪.৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Bandopadhyay, S (2004). *From Plasey to Partition : A History of Modern India. Delhi* : Orient Language.

Bayly. C. (1889). *Insperial Meridiann : The British Empire and the World. 1780-1830.* London : Longauau.

Chaudhuri. P. B. (1978) *The Trading World of Asia and the East India Company.* Cambridge : Cambridge University Press.

Lawson, P. (1993) *The East India Company : A History*. London and New York : Longauau.

Majumdar. R. (1946. 4th edition) *An Advanced History of India*. Calcutta. MacMillan.

Marshall. P. J. (1990. Reprint) *Bengal : The British Birdgehead of Eastern India 1740-1828.* vol. of The New Cmabridge History of India. Cambridge. Cambridge University Press.

Marshall, P. J. (1989) *The British in Asia : Trade to Dominion. 1700-1765 (vol. 2)* (P. Marshall ed.) London and New York : Oxford University Press.

Riyazu-S-Salatin. (2010). *A History of Bengal*. Translated from Original Persioan. (M. A. Salam, Trans) Nabu Press.

Sinha, N. (1967). *The History of Bengal (1757-1905)*. Calcutta : Calcutta University Press.

Spear, P. (1979 Reprint) *A History of India,* vol. 2. Penguin.